কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১	৪
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ২	৬
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৩	৮
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৪	৯
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৫	১০
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৬	১১
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৭	১৩
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৮	১৫
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৯	১৮
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১০	২৩
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১১	২৫
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১২	২৭
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৩	৩০
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৪	৩৪
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৫	৩৬
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৬	৩৯
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৭	৪৬
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৮	৪৯
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৯	৫২
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ২০	৫৫
কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ২১	৫৮
মহামায়া ও যোগমায়া	৬৩
মহামায়া ও যোগমায়া	৬৫
রাধারাণীর আবির্ভাব রাধাষ্টমী	৭১

BANGLADARSHAN.COM

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১॥

জন্মাষ্টমীর জন্য একটা সুযোগ এলো একটু কৃষ্ণনাম করার, সেই নাম দিয়ে শুরু হোক কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ।

গোপাল বন্দন

****

পাখি কুজনে নিশা অবসানে
গোপাল আসিল ঘরে,
দুর্যোগের রাতে যমুনার স্রোতে
বসুদেব মস্তক 'পরে।

ব্রহ্ম সনাতন হরি অবিনাশী
ঘটে ঘটে বাস যারই ,
খেলাবে তারে আপনই ক্রোড়ে
কী ভাগ্য যশোদা সুন্দরী।

BANGLADARSHAN.COM

জোছনা জিনিয়া অমিয় ছানিয়া
অনুপম তনুখানি,
ক্ষীর দধি সরে মিষ্টান্ন বাহারে
যশোদা খাওয়াবে ননী।

অতি মনোহর পায়ের নুপুর
ঝুনু ঝুনু রবে বাজে,
হাঁটে টলমল আধো আধো বোল
দৃষ্টি অন্যত্র সরে না যে।

গলে দোলে রত্নহার সকলে
অধর ফোলায় অভিমানে,
মুখমন্ডলে আঁকা ননীসর মাখা
শিখিপাখা চূড়ায় কুন্ডল করণে।

চূড়া করে বাঁধা কেশদাম সব
হাতে শোভে মোহন বেণু,
এমন গোপালে যশোদাদুলালে
ছুঁতে চায় রেণু রেণু।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গের জ্যোতি সে
নিত্যগোপাল প্রভু,

মোহন রূপে বিরাজে অন্তরে
সেই সে বিশ্ব বিভু।

সুন্দর বদন কমলদল লোচন
চন্দ্রের শোভন সে রূপ,
পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ প্রকট নন্দঅঙ্গন
দিব্য মায়াময় অপরূপ।

BAN OM

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ২॥

কলিযুগ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা:-

মহাভারতের যুদ্ধশেষে একদিন পঞ্চপাণ্ডব (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রশ্ন করেন যে “কলিযুগ কেমন হবে?”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন পাঁচ ভাইকে এক জঙ্গলের ভেতর পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে হেঁটে জঙ্গলের ভেতরে কি দেখলেন তা ফিরে এসে তাকে বলতে বললেন...

যুধিষ্ঠির ওই পথে হেঁটে যাওয়ার সময় একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন-একটা হাতি কিন্তু তার দুটি শুঁড় । এই কথা এসে জানালেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

উত্তরে: শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “কলি,যুগের মানুষ হবে ঠিক এই রকম । তারা মুখে বলবে এক, কিন্তু কাজের সময় হবে আলাদা।”

BANGLADARSHAN.COM

ভীম দেখতে পেলেন,একটা গরু তার বাছুরকে আদর করছে চেটে চেটে,কিন্তু এত বেশি চাটছে যে বাছুরটির গায়ের ছাল উঠে গিয়ে রক্তপাত শুরু হয়েছে। ভীম এই কথাটা শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানালেন।

উত্তরেঃ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “কলি যুগের মাতা,পিতা হবে ঠিক এইরকম। মাতা,পিতার অন্ধ স্নেহ ও অতিরিক্ত ভালোবাসাই তাদের সন্তানদের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে। এতে সন্তানরা বিচার বুদ্ধিহীন ও পরনির্ভরশীল ভাবে গড়ে উঠবে। আগামীতে যা স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন যাপনে তাদের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।”

অর্জুন দেখতে পেলেন, একটি নদীতে একটি পচাগলা মৃত ছাগল, আর ওই ছাগলের উপর বসে আছে একটা শকুন। কিন্তু ওই শকুনের ডানায় লেখা আছে বেদ মন্ত্র।

উত্তরেঃ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “কলিযুগের কিছু ভন্ড সাধকেরা হবে ঠিক এই রকমের। অর্থাৎ দেশ ও সমাজে যাদের ধার্মিক ও জ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি থাকবে, কিন্তু তাদের প্রকৃত মানসিকতা হবে শকুনের ন্যায়।”

নকুল দেখতে পেলেন, যে এক বিশালাকার পাথরের খন্ড পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু কোন বিশালবৃক্ষ তাকে আটকাতেই পারছে না। অবশেষে সামান্য একটা দুল্পা (গুল্ম) গাছের তলায় এসে আটকে যায়।”

উত্তরেঃ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “কলিযুগের মানুষের পাপের পরিমাণ হবে ওই পাথরের সমান। কিন্তু কোনো মানুষ যদি এই হরিনাম রূপী দুল্পা গাছটিকে ধরতে পারে, তাহলে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।”

সহদেব দেখতে পেলেন একটা বিশাল গভীর কূয়া। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন ওই কূয়ার শেষ প্রান্তে বিন্দুমাত্র জল নেই।

উত্তরেঃ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “কলিযুগের কিছু বাড়ি হবে বিশাল আকৃতির ও মানুষের ধনসম্পত্তি থাকবে ওই গভীর কূয়ার সমান, কিন্তু ওই বাড়ি ও ধনসম্পত্তি মালিকের মধ্যে বিন্দু মাত্র কোন সুখ থাকবেনা।”

BANGLADARSHAN.COM

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানানো পিতামহ ভীষ্মের:-

উত্তরায়ণ শুরুর আগে পান্ডবদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এলেন শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের শয্যার পাশে। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি পান্ডবদের বললেন, “জ্ঞানের শেষ প্রদীপটি নিভে যাচ্ছে, যা জানবার জেনে নাও এঁর কাছে।”

ভীষ্ম বললেন, “এতো তোমার ছল, এসেছো তো আমার শেষ লগ্নে দর্শন দিয়ে উদ্ধার করতে। তুমি থাকতে এদের কি উপদেশ দেব? তেমনই তো তুমিও এসেছো আজ শেষ দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করতে।”

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতোঃ যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তা হাতে গোনা যে কজন জানতেন, ভীষ্ম তাঁদের একজন। তাঁর মতে তিনি পুরাতন বৃদ্ধ জ্ঞানী মানুষদের মুখে শুনে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ বা গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর। তিনলোকে কে তাঁর সম্পর্কে বলতে পারে! তিনি তাঁর এক লোমকূপে ব্রহ্মান্ড ধারণ করতে পারেন।

সেই প্রভূই এই গোপাল অবতার বা শ্রীকৃষ্ণ অবতার। মায়াভরে মনুষ্যদেহ ধারণ করে এলেন। তাঁর লীলায় পৃথিবীবাসী ধন্য হল।

BANGLADARSHAN.COM

এঁনার নাভি কমল থেকেই স্রষ্টা ব্রহ্মার সৃজন হয়েছিল।

এঁনার ললাট বা কপাল থেকে বিধাতার জন্ম, চক্ষু থেকে সূর্যের।

এঁনার মনেতে জন্মালেন চন্দ্র, নিশ্বাসে পবন।

ব্রহ্মান্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট থেকে শ্রেষ্ঠ মহীপাল সবার মধ্যেই মায়ারূপে এই গোপালের অবস্থান।

হর্তা-কর্তা বিধাতা যিনি তিনিও গোপালের চরণ বন্দনা করেন।

পঞ্চমুখে সর্বক্ষণ মহেশ্বর শিব এঁনাকেই প্রণাম জানান।

চারি মুন্ডে বিধাতা ব্রহ্মা, সহস্র মুন্ডে শেষনাগ যাকে প্রণাম জানান তাদের কাছে তিনি তো সামান্য মনুষ্য মাত্র! শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা হলে পিতামহ সে স্থান ত্যাগ করতেন। তাই মৃত্যুর সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যে তাঁর মুক্তি হবে এই জেনে আশ্বস্ত হয়ে উত্তরায়ণের শুরুতেই তিনি দেহত্যাগ করলেন।

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৪॥

একটি পক্ষী পরিবার:-

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হবার কয়েক দিন আগে যুদ্ধক্ষেত্র পরিষ্কার করা হচ্ছে যাতে দুপক্ষেরই বিশাল বাহিনীর চলতে অসুবিধা না হয়।

গাছ ফেলে দেওয়া হচ্ছে ঐরাবত দিয়ে। এমন একটা গাছ উপড়ে দেবার পর দেখা গেল একটা ছোট পাখির বাসা ভেংগে পড়েছে। সেটিতে চারটি উড়তে না-শেখা ছানা রয়েছে। অসহায় মা পাখিটি এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ দেখেন যে আগামী যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে এসেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন।

মা পাখিটি সোজা চলে গেল শ্রীকৃষ্ণের কাছে। বললো-একমাত্র আপনিই আমাকে আর আমার ছানাদের, যারা এখনো উড়তে শেখেনি তাদের বাঁচাতে পারেন। রাখলে আপনিই রাখুন। মারলে আপনিই মারুন। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে আর হাতি, ঘোড়া বা মানুষের চাপে আমরা মারা পড়বো।

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণ বললেন-প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তুমি বাঁচবে বা মরবে। আমি তোমায় বাঁচাবার বা মারবার কে? তবে এককাজ করো তিন সপ্তাহের মত খাবার সংগ্রহ করে এক জায়গায় রাখো। পাখিটি চলে গেল।

পাখিটি চলে গেলে তিনি অর্জুনের কাছে তীর ধনুক চেয়ে নিয়ে যে হস্তি ওই গাছটি ভেঙেছিল তার গলার একটি ঘন্টা নিশানা করলেন এবং সফল হলেন। ঘন্টাটি মাটিতে পড়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ সেটির কাছে গেলেন এবং কিছুক্ষন পর এসে অর্জুনকে বললেন-চলো।

আঠারো দিন পর যুদ্ধ শেষ হল। আবার এলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সংগে তৃতীয় পাণ্ডব। চারিদিকে পড়ে রয়েছে অগণিত মৃতদেহ। মানুষ এবং পশুর। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই গেলেন সেই ঘন্টাটির কাছে।অর্জুনকে বললেন ঘন্টাটি তুলে ধরতে।

অর্জুন দেখলেন ঘন্টাটি ভারী এবং সেটিতে কয়েকটি ছিদ্র করা। অর্জুন সেটি তুলে নেবার সংগে সংগে এক, দুই, তিন,চার,পাঁচটি পাখি উড়ে গেল সেই ঘন্টাটির ভেতর থেকে৷ চারটি বাচ্চা পাখি আর তাদের মা।

একবার চক্কর দিয়েই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে উড়ে গেল তারা।শরণাগতকে তিনি যে সর্বদাই রক্ষা করেন।

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৫॥

মা যশোদা আগের জন্মে কে ছিলেন? কেন তিনি স্বয়ং ভগবানকে সন্তানরূপে লাভ করলেন?

মা যশোদা আগের জন্মে ধরাদেবী ছিলেন। এক গরীব ব্রাহ্মণের পত্নী। তারা দুজনেই ছিল ধর্মপরায়ণ। তাদের বাড়িতে অতিথি সেবাই চলত, কেউ এসে শুধু মুখে ফেরত যেত না। কিন্তু তারা এতটাই গরীব ছিল নিজেরাই দুবেলা খেতে পেত না। ভিক্ষা করে যা পেত তাই দিয়ে দিন চলে যেত কায়ক্লেশে।

একদিন ভগবান নারায়ণ ও নারদ মুনি তার ভক্তকে পরীক্ষা করতে ধরাদেবীর বাড়িতে অতিথি সেবার জন্য আসেন কিন্তু ধরাদেবীর বাড়িতে সেদিন কিছু ছিল না। তখন ধরাদেবী অতিথিদের গৃহে রেখে তার স্বামীকে ভিক্ষায় পাঠিয়ে দিলেন। সারাদিন ভিক্ষা করে ও কিছুই পাননি তার স্বামী। তিনি দেখতে পেলে অনেক দূরে একটা দোকান আছে। গোবিন্দ তার ভক্তকে পরীক্ষা করার জন্য মহাজন হলেন, তখন ধরা দেবী গেলেন দোকানির কাছে।ভিক্ষা চাইলে দোকানি কিছুই দিতে রাজি হল না।

ধরাদেবী কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না। অনেক অনুরোধ, উপরোধ,কাকুতি,মিনতি করলেন দোকানীকে। তখন দোকানি রাজি হলেন চাল দিতে কিন্তু একটা শর্তে। ধরাদেবীকে তার বুকের দক্ষিণ স্তন কেটে দিতে হবে। আর কোন ভাবে যেন চোখ দিয়ে নয়নের জল না ঝরে,যদি ঝরে তাহলে সেই জল শুধুই দক্ষিণ নয়নের ঝরবে, নচেৎ নয়। মনে মনে অনেকক্ষণ ভাবলেন ধরাদেবী কি করবেন!!! এই দিকে অতিথিসকল অভুক্ত। অনেকক্ষন ভাবার পর তিনি রাজি হলেন। তারপর তার একটি স্তন কেটে অন্ন নিয়ে এসে ভগবানের সেবা প্রস্তুত করলেন। অতিথিকে ভোজনের জন্য আসন দিলেন। তারপর অতিথি সেবা শুরু করলেন,হঠাৎ করে প্রাণগোবিন্দ তার অন্নের মধ্যে একফোঁটা রক্ত দেখতে পেলেন।

কারণ জানতে চাইলে ধরাদেবীর কাছে তিনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না বলতে। শত কষ্ট সহ্য করে অতিথির সামনে বলতে লাগলে ধরাদেবী আনুপূর্বিক ঘটনা কিন্তু কাঁদলেন না। ভগবান প্রাণগোবিন্দ দেবীর কথা শুনে নিজের নয়নজল আর ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন, “মাগো, জনমে জনমে যেন তোমার এই স্তন পান করতে পারি।” তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যেহেতু তিনি ভক্তের অধীন, তাই ভগবান যখন দ্বাপর যুগে জন্ম নিলেন,তাঁকে মাতা দৈবকী গর্ভে ধারণ করলেন আর তিনি দুগ্ধ পান করলেন মাতা যশোদার।

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৬॥

শ্রীকৃষ্ণের এক পায়ের নূপুর বড় এবং অন্য পায়ের নূপুর ছোট কেন?

আমরা অনেকেই বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা বা গোপাল পূজা করে থাকি।

পূজার আগে ভক্তিমনে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকেও সাজানোও হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে সাজানোর জন্য মস্তকে ময়ূর পালক, হাতে বাঁশি, পায়ে নূপুর সবই না থাকলে সাজ সম্পূর্ণ হয় না। তবে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে শোভিত নূপুর যুগল কখনও সমান হয় না। শ্রীকৃষ্ণের এক পায়ের নূপুর বড় এবং অন্য পায়ের নূপুর ছোট কেন?

পুরাণে বর্ণিত আছে ত্রেতা যুগে শ্রী বিষ্ণুর অবতার রূপে রামচন্দ্র এই ধরণীতে পাপ নাশ করতে অবতীর্ণ হন। দুষ্ট রাবণ সীতা দেবীকে হরণের পর শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত ভেঙে পড়েন।

শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে হারানোর পর রামধনুক মাটিতে রেখে কাঁদছিলেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মণও। হঠাৎ লক্ষ্মণ দেখতে পেলেন রামচন্দ্রের চোখের জল মাটিতে পড়ছে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যেখানে কাঁদছেন সেখানে চোখের জল পড়লেও তা রক্ত হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্মণভ্রাতা রামচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, “ভ্রাতা একি, আপনি কাঁদছেন, অথচ মাটিতে রক্ত দেখা যাচ্ছে কেনো?” তখন রামচন্দ্র ধনুক সরিয়ে দেখেন, একটি ব্যাঙ ধনুকের নিচে চাপা পড়ে আছে, আর ধনুকের আঘাতে তারই রক্ত সেখানে।ব্যাঙের রক্ত এবং শ্রীরামের চোখের জল মিশে সৃষ্টি হয়েছে নদী। শ্রীরাম তখন বুঝলেন এই ব্যাঙ কোন সাধারণ ব্যাঙ নয়। তখন রামচন্দ্র ব্যাঙটিকে জিজ্ঞেস করলেন, “সর্পের দ্বারা আক্রান্ত হলে তো তুমি আর্তনাদ করো। তবে আমার ধনুকের নীচে চাপা পড়েও কেন প্রতিবাদ করলে না?”

উত্তরে ব্যাঙটি শ্রীরামকে প্রণাম করে বলল, “প্রভু,যখন কোন সর্প আমায় আক্রমণ করে, তখন আর্তনাদ করে আপনকে নালিশ জানাই। কিন্তু যখন আপনার কাছেই আমার প্রাণ সঙ্কটে তখন কাকে নালিশ জানাবো?”

তখন রামচন্দ্র বললেন, “তুমি পুর্ব জন্মে কি ছিলে?”

ব্যাঙ তখন নিজের আসল পরিচয় দিয়ে বলল, “আমি পূর্বজন্মে ছিলাম কর্ণব মুনি। বিশ্বাবসু মুনি ছিলেন আমার গুরু। গুরুর চরণ সেবা করতে গিয়ে একদিন নখের আছড় লেগেছিলো গুরুর পায়ে। তখন গুরুদেব আমায় অভিশাপ দিয়েছিলেন, আমার পরজন্মে ব্যাঙকুলে জন্ম হবে।

অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে গুরু আমাকে আশির্বাদও দিয়েছিলেন, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র অবতার রূপে জন্ম নিলে আমার উদ্ধার হবে।

সব কিছু শ্রবণ করার পর শ্রীরাম ব্যাঙকে বললেন, “অবচেতন মনে হলেও তুমি আমার দ্বারা নিহত হয়েছো, এবার বলো তোমার শেষ ইচ্ছে কি?”

তখন ব্যাঙ বললো, “আমার শেষ ইচ্ছা আমার গুরু যেনো অন্তিমকালে আপনার শ্রীচরণে ঠাই পান।”

তখন রামচন্দ্র ব্যাঙটিকে বলেছিলেন, আমি যখন পরের যুগে অর্থাৎ দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করবো, তখন তুমি থাকবে আমার ডান পায়ের নুপুর আর তোমার গুরুদেব বিশ্বাবসু হবেন আমার বাম পায়ের নুপুর। তবে দুজন ছোট বড় হয়ে আমার পায়ের নুপুর হয়ে থাকবে।”

এবং গুরু এবং শিষ্যের ভেদ বোঝাতে তার বাম চরণে ছোট ও ডান চরণের নূপুরটি বড় হবে।

এরপর দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সাথে সাথেই কংসের কারাগারে শিশুকৃষ্ণের শ্রীচরণে সেই নূপুরদ্বয় ‘কর্ণব’ আর ‘বিশ্বাবসু’ দৈবযোগে হাজির হয়ে ঠাঁই নিলো।

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৭॥

যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন:-

নন্দালয়ে সদ্যজাত কৃষ্ণ স্থানান্তরীত হওয়ার পর সকলের প্রাণপ্রিয় হলো শিশু কৃষ্ণ বা গোপাল। কিন্তু সমস্যা একটিই বড্ডো দুষ্টুমি তার, যদিও তা ভালোই লাগে। যতো দিন যায়, ততো কৃষ্ণের দুষ্টুমি বাড়ে। কিছুতেই তাকে আর সামলানো যায় না।

প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই তার নামে অভিযোগ জানায়। মা যশোদা সব শোনেন, কিন্তু তার গোপালকে শাসন করবেন কী তিনি, ছোট্ট ছোট্ট হাতে যখন আঁকড়ে ধরে তাঁকে, তখন সব ভুলে যান যশোদা।

তাঁর ছোট্ট গোপাল যে রয়েছে তাঁর জীবন জুড়ে, ভিতরে বাইরে, তাঁর আদরের গোপাল। অনেকেই এসে যশোদাকে বলে, “তোমার গোপাল অনেক ছলচাতুরি করতে শিখেছে, বড় হলে কী যে হবে ওর ভেবে দেখেছো? বাঁধা বাছুরকে খুঁটি থেকে খুলে দেয়,বাঁধনহারা বাছুর গাভীর সব দুধ খেয়ে নেয়, এমনকী ননী চুরি করে খেয়ে নেয়,আবার বন্ধুদেরও বিলোয়,কিছু বললে আমাদের বেণী ধরে টানও মারে।”

যশোদা সব শোনেন,মাঝেমধ্যে শাসনও করেন তাঁর আদরের গোপালকে, এভাবেই দিন যায়, ক্রমশ বড় হয় কৃষ্ণ,বলরাম...একদিন হয়েছে কি,যশোদা কৃষ্ণকে পুকুরের পাড়ে বসিয়ে নাইতে নেমেছেন, এসে দেখেন কৃষ্ণের মুখে মাটি লেগে আছে, যশোদা বুঝলেন কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। এদিকে কৃষ্ণের সখারাও অভিযোগ করে বলছে সে মাটি খেয়েছে।

এই অভিযোগকারীদের দলে কৃষ্ণভ্রাতা বলরামও ছিলো। কৃষ্ণ বললো, “ওরা সব মিছে কথা বলছে,আমি মাটি খাইনি,মা তুমি দেখো না আমি হাঁ করছি,তাহলে তো প্রমান হবে, আমি মিছে না সত্যি বলছি।”

যশোদার সামনে বালক কৃষ্ণ একটা বিশাল হাঁ করলো। কিন্তু এ কী দেখছেন যশোদা!!! কৃষ্ণের মুখের ভেতর সারা বিশ্বচরাচর, লক্ষ্মীসহ বিষ্ণু শায়িত রয়েছেন তাঁর অনন্ত নাগের শয্যায়। মাতা যশোদাকে বিশ্বরূপ দর্শন করালো বালক কৃষ্ণ। এসব দেখে যশোদা অজ্ঞান হয়ে গেলেন, জ্ঞান ফিরলে অবাক হয়ে ভাবলেন, “এ কী দেখালো তাঁর গোপাল!!!” পরম মমতায় কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন যশোদা। বুঝতে পারলেন তাঁর আদরের গোপালের দৈবীসত্তা, কিন্তু তাঁর কাছে সে শুধুই যে তাঁর আদরের নয়নমণি যশোদাদুলাল!!!

যা যশোদার
বিশ্বরূপ দর্শন

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি:-

শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশির অর্থ ও তাৎপর্য:

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তার বাল্যলীলা করছিলেন, তখন খেলা করতে করতে একদিন নদীর তীরে যান। সেখানে দেখেন একজন বৃদ্ধ বাঁশি বাজাচ্ছেন এবং বাঁশি বিক্রি করছেন।

ঐ বাঁশির সুর শুনে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ লোকটির কাছে যান এবং বলেন, “হে মহাত্মন,আপনার বাঁশির সুর খুব সুন্দর। আপনি কি আমাকে শেখাবেন বাঁশি বাজানো?”

তখন বৃদ্ধ লোকটি বললেন “তুমি খুব ছোট। তুমি পারবে না বাঁশি বাজাতে।”

তখন একথা শুনে গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ কাঁদতে লাগলো এবং বললো “আমি পারবো, দয়া করে আমাকে শিখিয়ে দিন।” বৃদ্ধ ব্যক্তিটির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা দেখে খুব দয়া হলো।

BANGLADARSHAN.COM

তারপর সেই বৃদ্ধ বললেন-“আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে শিখাবো।”

তখন শ্রীকৃষ্ণ খুবই আনন্দিত হলেন। বৃদ্ধ লোকটি শ্রীকৃষ্ণ এর হাতে একটি বাঁশি দিল এবং বললো “আমি যেভাবে বাজাবো তুমিও ঠিক সেইভাবে বাঁশি বাজাবে।”

শ্রীকৃষ্ণ বললো “ঠিক আছে।”

বৃদ্ধ যখনই বাঁশিতে ফুঁ দিল, মা সরস্বতীকে স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণও তখনই বাঁশিতে ফুঁ দিল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বাঁশি সুর তুললো সেই সুর শুনে সমস্ত দেবদেবী, সমস্ত জীব জগৎ বিমোহিত হয়ে গেল। তখন বৃদ্ধ লোকটি ভাবলো এ তো কোন সাধারণ বালক নয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন একাগ্রতার সঙ্গে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল, সেই সময় বৃদ্ধ লোকটি তার চরণে শুয়ে পড়লো। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে বাঁশি এলো এবং শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজানো শুরু করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি ধরণের বাঁশি বাজাতেন?
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিন প্রকার বাঁশি ব্যবহার করেন। তার একটিকে বলা হয় বেণু, অন্যটি মুরলী এবং আরেকটি বংশী।

বেনু অত্যন্ত ছোট,তাতে ৬ টি ছিদ্র থাকে, যেটি নাকি ষটচক্রের প্রতীক ।

মুরলীর দৈর্ঘ্য প্রায় আঠারো ইঞ্চি। যাতে এক প্রান্তে ১ টি, গায়ে ৪ টি ছিদ্র থাকে ।

বংশী প্রায় ১৫ ইন্ছি। তাতে ৯ টি ছিদ্র থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন অনুসারে এই বাঁশিগুলো ব্যবহার করেন।

তবে আরেকটি বাঁশি আছে যা আরও বেশী লম্বা, যাকে বলা হয় মহানন্দ ও সম্মোহিনী। একে আকর্ষণীও বলা হয়।

এর চেয়ে যদি লম্বা হয় বাঁশি সেটা আনন্দিনি। এই আনন্দিনি বাঁশি ব্রজ গোপবালক সখাদের অত্যন্ত প্রিয়। এর আর একটি নাম বংশুলী। এই বাঁশিগুলি কখনও মনিরত্ন খচিত থাকে। কখনও তা মর্মর দিয়ে তৈরী হয়। এবং কখনো বাঁশ দিয়ে তৈরী হয়। বাঁশি যখন মণিরত্ন দিয়ে তৈরী হয় তখন তাকে বলে সম্মোহনী। আর যখন তা স্বর্ণ দিয়ে তৈরী হয় তাকে বলে আকর্ষনী।

বিদগ্ধ মাধব গ্রন্থে শ্রীল রূপগোস্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির বর্ণনা করে বলেছেন–

“শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির অপূর্ব সুন্দর সুরের প্রভাবে শিবের ডমরু বাজানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রজাপতি দেব ব্রহ্মার চমকিত হয়ে গেলেন। সমস্ত দেব দেবীরা এমন সুন্দরের চেয়ে সুন্দর সুর শ্রবণ করে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেন মহা আনন্দে। অনন্ত শেষনাগ বাঁশি শ্রবণ করে তার মস্তক আন্দোলন করতে শুরু করল। ব্রহ্মান্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠলোকে ধ্বনিত হয়েছে সেই বাঁশির সুর লহরী।”

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীকৃষ্ণের এই বাশির সুর শুনে সমগ্র বৃন্দাবনবাসীই মোহিত হয়ে যেতেন। ছোট, বড়, গোপ, গোপী সকলকেই আকর্ষণ করতো সেই সুর। এ যেন এক অদ্ভুত দিব্য সুর। এ যেন ৭ পরমাত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণ।”

আসলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশির মধ্য দিয়ে তার ভক্তদের তার কাছে ডাকেন অহরহ। এই বাঁশি আত্মাকে স্মরণ করায় পরমাত্মার কথা। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ আকর্ষণের কেন্দ্র, বাঁশির সুর ভক্তহৃদয়ে আলোড়ন তোলে। নয়ন মুদিত রেখেও অন্তরে গোবিন্দর দর্শন হয়।

এই বাঁশি কারা শুনতে পাবেন?
এখনো বৃন্দাবনে গেলে বাঁশির আওয়াজ শোনেন কেউ কেউ। যারা সরল নিরহংকারী,যারা সৎ, কৃষগত প্রাণ-সেই সকল ভক্তরা আজও বৃন্দাবনে গেলে বংশীধ্বনি শুনতে পান। আপনিও শুনতে পারেন সেই বাঁশি তার জন্য সবার আগে অন্তরে বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে, শুদ্ধ করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে তিনি আছেন আপনার মধ্যেও আর পাপীর মধ্যেও।কারোর প্রতি রাগ দ্বেষ হিংসা ইত্যাদি করবেন না।কারোর অনিষ্ট চাইবেন না। অন্তর থেকে শিশুর মতো সরল হোন এটিই তাঁকে লাভ করার প্রথম শর্ত। শুদ্ধাভক্তিই আর সারল্য সেই বাঁশি শোনার সহজ পথ।

“বাজে রে মুরলিয়া বাজে,
অধর ধরে মোহন মুরলী পর,

হোনটপে মায়া বিরাজে।
হরে হরে বাঁশকে বানি মুরলিয়া
মরম মরমকো ছুঁয়ে আঙ্গুরিয়া
চঞ্চল চতুর আঙ্গুরিয়া জিস পর
কনক মুন্ডারিয়া সাজে।”

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ৯॥

অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করানো:-

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকেই নিজের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন কৃষ্ণ। বাসুদেবের সৌম্য, উগ্র ও অত্যন্ত উগ্র রূপ দেখে আনন্দ ও ভয় মিশ্রিত অনুভূতি এবং কৃষ্ণের বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গীতার বিশ্বরূপ দর্শন যোগ শীর্ষক অধ্যায়। এই অধ্যায় কৃষ্ণ-অর্জুন এবং সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র কথোপকথনের মাধ্যমে বিশ্বরূপ যোগ বোঝা যায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর শরীরের যে কোনও একটি অংশে বিদ্যমান, সেই ভগবান আমার সারথি হয়ে হাতে ঘোড়ার রাশ ও চাবুক নিয়ে বসে আছেন এবং আমার আজ্ঞার পালন করছেন–এ দিকে দৃষ্টি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন ঈশ্বরের মহান কৃপাকে দেখে ভাববিভোর হয়ে যান এবং বলেন–শুধু আমার ওপর কৃপা করার জন্য আপনি যে পরম গোপনীয় আধ্যাত্মিক কথা (সকলের মূলে আমিই আছি) বলেছেন, তাতে আমার মোহ কেটে গিয়েছে। কারণ, হে কমলনয়ন! আমি আপনার কাছে প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিস্তারিত বর্ণনা শুনেছি এবং আপনার অবিনাশী মাহাত্ম্যও শুনেছি। হে পুরুষোত্তম! আপনি আমাকে নিজের অলৌকিক প্রভাবের যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তা ঠিক এমনই। হে পরমেশ্বর! এবার আমি আপনার সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখতে চাই, যাঁর একটি অংশে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছে। হে প্রভু! যদি আপনি এমন মনে করেন যে আমি আপনার সেই ঈশ্বরীয় রূপ দেখতে পারব, তা হলে হে যোগেশ্বর! আপনি নিজের অবিনাশী রূপের দর্শন দিন।

অর্জুনের প্রার্থনা শুনে (তাঁকে বিরাট রূপ দেখার আজ্ঞা দিয়ে) কৃষ্ণ বলেন, হে পার্থ! তুমি আমার একটি নয়, শত, হাজার এমন অলৌকিক রূপ দেখ, যাঁর গঠনও নানান ধরণের, রঙও নানান ধরণের এবং আকৃতি নানান ধরণের। হে ভারত! আমার সেই দিব্য রূপে তুমি দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দুজন অশ্বিনী কুমার–এই ৩৩ (ধরনের) দেবতাদের ও উনপঞ্চাশ মরুদ্গণকেও দেখ। এ ছাড়া যাকে তুমি আগে কখনও দেখনি, এমন আশ্চর্যজনক রূপও প্রত্যক্ষ কর। হে গুড়াকেশ! তুমি আমার শরীরের যে কোনও একটি অংশে চরাচর-সহ সম্পূর্ণ জগৎকে এখনই দেখে নাও, এতে দেরি করো না। এ ছাড়া তোমার মনে আর যা কিছু (যুদ্ধের পরিণাম) দেখার ইচ্ছা আছে, তা-ও দেখে নাও।

ঈশ্বর বার বার অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ দেখার আজ্ঞা দেন, কিন্তু অর্জুন কিছু দেখতে পারেন না। তাই কৃষ্ণ বলেন–কিন্তু তুমি নিজের এই চোখ (চর্মচক্ষু) দিয়ে আমার দিব্য রূপ দেখতে পারবে না। তাই আমি তোমায় দিব্য চক্ষু দিচ্ছি। যার সাহায্যে তুমি আমার ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখতে পারবে।

সঞ্জয় বলেন–হে রাজন! অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিজের পরম ঐশ্বরিক বিরাট রূপ দেখান। যার অনেক মুখ ও চোখ আছে, নানান ধরণের অদ্ভূত রূপ আছে। অনেক অলৌকিক অলঙ্কার আছে, হাতে নানান দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র আছে এবং যাঁর গলায় নানান ধরণের দিব্য মালা আছে, যে অলৌকিক বস্ত্র পরে আছেন ও যাঁর ললাট ও শরীরে দিব্য চন্দন, কুমকুম ইত্যাদি লাগানো রয়েছে, এমন সর্বথা আশ্চর্যময় ও সমস্ত দিকে মুখ থাকা নিজের অনন্ত দিব্য রূপ ঈশ্বর দেখান। যদি আকাশে একসঙ্গে হাজার সূর্যোদয় হয়, তখনও তাদের সকলের প্রকাশ মিলে সেই বিরাট রূপের প্রকাশের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। অর্জুন দেবতাদের দেবতা

ঈশ্বরের শরীরের একটি অংশে সম্পূর্ণ জগৎকে নানান বিভাগে বিভক্ত দেখেছে। যাঁর কল্পনাও করেনি, এমন বিরাট রূপ দেখে অর্জুন আশ্চর্যচকিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর শিহরণ দেখা দেয়। তিনি করজোড়ে এবং মাথা নুইয়ে প্রণাম করে বিরাট রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে শুরু করেন।

ঈশ্বরের সৌম্য দেবরূপ দর্শন ও বর্ণনা:-

অর্জুন বলেন–হে দেব! আমি আপনার শরীরে সম্পূর্ণ দেবতা, প্রাণীর বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে, কমলাসনে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মাকে, কৈলাসে অধিষ্ঠিত শঙ্করকে, সম্পূর্ণ ঋষি ও পাতাল লোকে বসবাসকারী দিব্য সর্পদেরও দেখছি। হে বিশ্বরূপ! হে বিশ্বেশ্বর! আমি আপনাকে অনেক হাত, পেট, মুখ ও নেত্র সম্পন্ন ও সমস্ত দিক দিয়ে অনন্ত রূপ সম্পন্ন দেখছি। আমি আপনার না তো আদি, না মধ্য ও না অন্তই দেখছি। আমি আপনার মাথায় মুকুট ও হাতে গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করে থাকতে দেখছি। এ ছাড়া আমি আপনাকে অনন্ত তেজ সম্পন্ন, সমস্ত দিকে প্রকাশ স্বরূপ, দেদীপ্যমান অগ্নি তথা সূর্যের সমান কান্তিবান, নেত্র দ্বারা কাঠিন্যের সঙ্গে দেখা যায় এমন যোগ্য ও সমস্ত তরফে অপ্রমেয় দেখছি। আপনিই জানার যোগ্য পরম অক্ষর ব্রহ্ম (নির্গুণ-নিরাকার) , আপনিই সম্পূর্ণ সংসারের পরম আধার (সগুণ-নিরাকার), আপনিই সনাতন ধর্মের রক্ষক (সগুণ-সাকার) এবং আপনিই অবিনাশী সনাতন পুরুষ–এমন আমি মনে করি।

ঈশ্বরের উগ্র রূপ দর্শন ও বর্ণনা:-

আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত অনন্ত প্রভাবশালী, অনন্ত ভুজা সম্পন্ন চন্দ্র তথা সূর্যরূপ নেত্র সম্পন্ন, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরূপ মুখ সম্পন্ন ও নিজের তেজে সম্পূর্ণ সংসারকে তপ্ত করতে পারেন–এমন দেখছি। হে মহাত্মন্! স্বর্গ তথা পৃথিবীর মধ্যের অন্তরাল ও দশ দিক পরস্পরের দ্বারা পূর্ণ। আপনার এই অদ্ভূত উগ্ররূপ দেখে তিন লোক ভয়ভীত হচ্ছে। আমি যখন স্বর্গে যাই, তখন যে দেবতাদের দেখি, সেই সমস্ত দেবতাদেরও আপনার স্বরূপে প্রবিষ্ট হতে দেখছি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভয়ভীত হয়ে হাত জোড় করে আপনার গুণগান করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধ সম্প্রদায় কল্যাণ হোক! মঙ্গল হোক! এমন কথা বলে উত্তম-উত্তম স্তোস্ত্র দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন। যে ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ৮ বসু, ১২ সাধ্যগণ, ১০ বিশ্বদেব, দুই অশ্বিনী কুমার, ৪৯ মরুদ্গাণ ও সাত পিতৃ ও গন্ধর্ব, যজ্ঞ, অসুর ও সিদ্ধের সম্প্রদায়। সে সকলে আশ্চর্যচকিত হয়ে আপনাকে দেখছেন।

ঈশ্বরের অত্যন্ত উগ্ররূপ দর্শন ও বর্ণনা:-

হে মহাবাহো! আপনার অনেক মুখ, নেত্র, ভূজা, জঙ্ঘা, চরণ, উদর ও ভয়ঙ্কর দাঁতযুক্ত মহান উগ্র রূপকে দেখে সমস্ত প্রাণী ভয়ে ভীত হচ্ছেন, এমনকি আমি নিজে ভীত হচ্ছি। হে বিষ্ণো! আপনার দেদীপ্যমান বর্ণ সম্পন্ন, গগনচুম্বী, ছড়িয়ে থাকা মুখ ও দেদীপ্যমান বিশাল নেত্রযুক্ত ভয়ঙ্কর রূপ দেখে অন্তর থেকে ভয়ভীত হচ্ছি। ধৈর্য ও শান্তিও লাভ করছি না আমি। আপনার প্রলয়ের অগ্নির সমান প্রজ্জ্বলিত ও দাঁতের কারণে ভয়ানক মুখ দেখে না তো দিশার জ্ঞান হচ্ছে, না শান্তি পাচ্ছি। তাই হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হোন। আমাদের পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধা-সহ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণও আপনার মধ্যে প্রবেশ করছেন।

রাজাদের সম্প্রদায়-সহ ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র আপনার ভয়ঙ্কর দাঁতযুক্ত মুখ দেখে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার চূর্ণ-বিচূর্ণ মস্তিষ্ক-সহ আপনার দাঁতের মধ্যে আটকে রয়েছেন। যে ভাবে

নদীর জলের প্রবাহ স্বাভাবিক ভাবে সমুদ্রের দিকে ধাবমান, তেমনই সংসারের সেই (ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদির মতো ধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করেছেন যাঁরা) মহান শূরবীর আপনার দেদীপ্যমান মুখে প্রবেশ করছেন। পতঙ্গ যে ভাবে মোহবশে এসে নিজের নাশ করার জন্য গতিতে দৌড়ে গিয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এই (রাজ্য ও লোভের দৃষ্টি যুদ্ধ করে থাকা দুর্যোধন ইত্যাদি) সকলে মোহবশে নিজের নাশ করার জন্য দ্রুত গতিতে দৌঁড়ে আপনার মুখে প্রবেশ করছে। আপনি নিজের প্রজ্জ্বলিত মুখের দ্বারা সমস্ত লোকের ভক্ষণ করতে করতে সমস্ত দিক দিয়ে তাঁদের বার বার চেটে যাচ্ছেন। হে বিষ্ণো! আপনার উগ্র প্রকাশ নিজের তেজে সম্পূর্ণ জগৎকে পরিপূর্ণ করে সকলকে তপ্ত করছে।

কৃষ্ণের অত্যন্ত উগ্র রূপ দেখে অর্জুন এতটাই ভয় পেয়ে যান যে সখা কৃষ্ণকে জিগ্যেস করেন– হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনাকে প্রণাম। আপনি প্রসন্ন হন। আমাকে বলুন এই উগ্ররূপের আপনি কে? আমি আপনাকে তত্বের মাধ্যমে জানতে চাই। কারণ আমি জানি না বাস্তবে আপনি কী করতে চাইছেন?

কৃষ্ণ বলেন–আমি সমস্ত লোকের নাশ করার জন্য কাল স্বরূপ, এ সময় সকলের নাশ করার জন্য এখানে এসেছি। তোমার বিপক্ষে যে যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে, তুমি যুদ্ধ না-করলেও তাঁরা জীবিত থাকবেন না, কারণ তাঁরা সকলে আমার দ্বারা প্রথমেই হত হয়েছেন। তাই তুমি যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে যাও এবং যশ লাভ কর ও শত্রু জয় করে ধন ধান্যে সম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর। হে সব্যসাচী অর্জুন! তুমি এঁদের বধের নিমিত্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ নিজের পূর্ণ শক্তি লাগিয়ে দাও, কিন্তু অভিমান করো না। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্য যত নামী শূরবীর রয়েছেন, তাঁরা সকলে আমার দ্বারা প্রথমেই হত হয়েছেন। আমার দ্বারা হত শূরবীরদেরই তুমি বধ কর। কষ্ট পেও না, যুদ্ধ কর। যুদ্ধে তুমি নিঃসন্দেহে শত্রু জয় করবে।

সঞ্জয় বলেন–কেশবের এই বাণী শুনে ভয়ে কম্পমান কিরীটধারী অর্জুন হাত জোড় করে নমস্কার করে ভীত হয়ে ফের প্রণাম করে গদগদ বাণীতে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি শুরু করেন।

অর্জুন বলেন–হে অন্তর্যামী ভগবান! ভক্ত দ্বারা আপনার নাম, গুণ ইত্যাদির কীর্তন করলে এই সম্পূর্ণ জগৎ হর্ষিত হচ্ছে। আবার আপনার মধ্যে মন লীন হওয়ায় প্রেম লাভ করছেন। যত রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ আছে, সে সকলে আপনার নাম, গুণ, ইত্যাদির কীর্তন করে ভীত হয়ে দশ দিকে ছুটছে ও সিদ্ধ, সন্ত মহাত্মার সম্প্রদায় আপনাকে নমস্কার করছে। হে মহাত্মন্! আপনি গুরুদেরও গুরু ও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও উৎপত্তিকর্তা। তাই আপনাকে নমস্কার করা উচিত।

হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি অক্ষর স্বরূপ। আপনি সত্ ও আপনিই অসত্। এমনকি সত্-অসত্-এর ঊর্ধ্বে যা কিছু আছে তা-ও আপনি। আপনিই সম্পূর্ণ দেবতার আদি দেবতা। আপনিই চিরকালের পুরাণ পুরুষ। আপনিই সম্পূর্ণ সংসারের পরম আধার। আপনিই সকলকে জানেন এবং সকলের দ্বারা জানার যোগ্য। আপনিই পরম ধাম। হে অনন্তরূপ! সংসারের কণায় কণায় আপনিই ব্যাপ্ত। আপনিই বায়ু, যমরাজ, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রমা, দক্ষ ইত্যাদি প্রজাপতি ও প্রপিতামহ ব্রহ্মারও পিতা। আপনাকে হাজার বার নমস্কার! নমস্কার! বার বার আপনাকে নমস্কার। নমস্কার হোক! হে সর্বস্বরূপ! আপনাকে সামনে থেকে নমস্কার, পিছন থেকে নমস্কার! সবদিক থেকে আপনাকে নমস্কার!

হে অনন্ত শক্তি ধর! আপনি অসীম পরাক্রমধারী। সম্পূর্ণ সংসারকে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অতএব সমস্ত কিছু আপনি। হে অচ্যুত! আপনার এমন বিলক্ষণ মহিমা ও স্বরূপকে না-জেনে আমি প্রথমে আপনাকে সখা মনে করে প্রমাদ অথবা ভালোবাসার কারণে কোনও চিন্তাভাবনা না-করে, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! এ ধরণের যা কিছু বলেছি এবং আপনাকে নিজের সমান সাধারণ মিত্র ভেবে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, একা অথবা সখা ও কুটুম্বদের সামনে হাসি-মজায় আপনার যে অপমান করেছি, সে সবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
এই চরাচর সংসারের পিতা আপনি, পূজনীয়ও আপনি এবং গুরুর মহান গুরুও আপনি। হে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান! এই ত্রিলোকে আপনার মতো অন্য কেউ নেই। আপনার চেয়ে অধিক কী ভাবে হতে পারে! তাই স্তুতির যোগ্য আপনি ঈশ্বরকে, আমি প্রণাম করে প্রসন্ন করতে চাই। যে ভাবে পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের ও স্বামী স্ত্রীর অপমান সহ্য করে নেয়, অর্থাৎ ক্ষমা করে দেয়, দেব এমনই! আপনিও আমার দ্বারা করা অপমানের ক্ষমা করুন। যাকে আগে কখনও দেখিনি, সেই আশ্চর্যজনক রূপ দেখে আমি খুশি হচ্ছি। পাশাপাশি সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আমার মন ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে। তাই হে দেবেশ! আপনি প্রসন্ন হন এবং আমাকে নিজের সেই সৌম্য দেবরূপ (বিশ্বরূপ) পুনরায় দেখান, যা আমি এখন শুরুতে দেখেছিলাম। আমি আপনাকে মাথায় মুকুট ও হাতে গদা, চক্র, শঙ্খ, পদ্ম-সহ দেখতে চাই। তাই হে সহস্রবাহো! আপনি সেই চতুর্ভূজ রূপে প্রকট হয়ে যান।

কৃষ্ণ বলেন–হে অর্জুন! তুমি ভয় পেও না। কারণ আমি প্রসন্ন হয়েই নিজের সামর্থ্যে তোমাকে এই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, তেজস্বরূপ, সকলের আদি ও অনন্ত বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। এ ধরণের বিশ্বরূপ তুমি ছাড়া আগে আর কেউ দেখেনি। হে কুলশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যলোকে এ ধরণের বিশ্বরূপকে বেদ ও শাস্ত্রের অধ্যয়নের মাধ্যমে, যজ্ঞের মাধ্যমে, দান ও উগ্র তপস্যার মাধ্যমে এবং বড় বড় কাজের মাধ্যমেও দেখা যায়নি। তোমার মতো কৃপাপাত্রই আমাকে কৃপার মাধ্যমে দেখতে পারে। আমার এমন উগ্ররূপ দেখে তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়, মোহিতও হতে নেই। এবার তুমি নির্ভয় ও প্রসন্ন মনের হয়ে আমার সেই চতুর্ভূজ রূপকে ভালো করে দেখ।

সঞ্জয় বলেন–এমন বলে বাসুদেব প্রথমে অর্জুনকে নিজের চতুর্ভূজ রূপ দেখান, তার পর অর্জুনের প্রসন্নতার জন্য মহাত্মা কৃষ্ণ পুনরায় নিজের দ্বিভূজ মনুষ্যরূপ ধারণ করে নেন এবং অর্জুনকে আশ্বস্ত করেন।

অর্জুন বলেন- হে জনার্দন! আপনার এই সৌম্য মনুষ্যরূপ দেখে আমার চিত্ত স্থির হয়ে গিয়েছে এবং আমি নিজের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এসে গিয়েছি।

কৃষ্ণ বলেন–তুমি আমার যে চতুর্ভূজ রূপ দেখেছ, তার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। দেবতাও এই রূপ দেখার জন্য লালায়িত থাকেন। বেদ, দান, তপ ও যজ্ঞের মাধ্যমে এই চতুর্ভূজ রূপ দেখা যায় না। কেবল অনন্য ভক্তির সাহায্যে তত্ব থেকে আমার এই রূপ জানা যেতে পারে, সাকার রূপে দেখা যেতে পারে। হে পাণ্ডব! যে কেবল আমার প্রসন্নতার জন্য সমস্ত কর্ম করে, আমার আশ্রয়ে থাকে, আমারই প্রেমী ভক্ত হয়ে, সর্বদা আসক্তিরহিত হয়ে ও কোনও প্রাণীর সঙ্গে শত্রুতা রাখে না, সেই ভক্ত আমাকে লাভ করে।

BA OM

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১০॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময়ের দশটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা:-

এই ঘটনা বিবৃত করতে বসে এই নজরুলগীতিটা মনে পড়ল:

তিমিরবিদারী অলখবিহারী
কৃষ্ণমুরারী আগত ওই,
টুটিল আগল, নিখিল পাগল,
সর্বসহা আজি সর্বজয়ী।
বহিছে উজান অশ্রু যমুনায়,
হৃদি বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়,
বসুধা যশোদা স্নেহভার উছলায়,
কালো রাখাল নাচে থৈ তাথৈ।
বিশ্বভরি ওঠে স্তব নমো নমো,
অরির পুরী মাঝে এলো অরিন্দম।
ধরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরী জন
কারার মাঝে এলো বন্ধ বিমোচন,
ধরি অজানা রূপ আসিল অনাগত
স্মরিয়া ব্যথা মাগো ডাকে মাভৈ।

BANGL

১. অষ্টম মনু বৈবস্তবের মন্বন্তরের ২৮ দ্বাপরে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ছিলেন। তাঁর জন্মের সময় ভাদ্রপদ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির সাতটি মুহূর্ত সমাপ্ত হয় এবং অষ্টম মুহূর্ত উপস্থিত হয়। তখন মধ্যরাতে সর্বাধিক শুভ লগ্নে কৃষ্ণের জন্ম হয়। সেই লগ্নে কেবল শুভ গ্রহের দৃষ্টি ছিল। সে সময় রোহিণী নক্ষত্র ও অষ্টমী তিথির সংযোগে জয়ন্তী নামক যোগে তাঁর জন্ম হয়। জ্যোতিষীদের মতে, কৃষ্ণের জন্মের সময়, রাত ১২টায় শূণ্য কাল ছিল।

২. স্বয়ং বিষ্ণু কারাগৃহে উপস্থিত হয়ে দেবকী ও বাসুদেবকে দর্শন দেন এবং তাঁদের পূর্বজন্মের তপস্যা সম্পর্কে জানান। তার পুণ্যফলের জন্যই দেবকী ও বাসুদেবের কাছে তিন বার অবতার নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বিষ্ণু দেবকীকে জানান যে, প্রথম জন্মে বৃষ্ণীগর্ভ নামক এক পুত্র হয়। দ্বিতীয় জন্মে দেবকী যখন দেবমাতা অদিতি ছিলেন, তখন বিষ্ণু ছিলেন তার পুত্র উপেন্দ্র, এবং তিনিই বামন অবতারে রাজা বলিকে উদ্ধার করেন। এবার তৃতীয় জন্মে দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তাঁর প্রতিশ্রুতি পুরো করেন বিষ্ণু।

৩. কৃষ্ণের জন্মের সময় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। সে সময় যমুনায় ঝড় বইছিল। মনে করা হয়, সে দিনের আগে এমন বৃষ্টি কেউ দেখেনি।

৪. কৃষ্ণ জন্মের সময় বিষ্ণুর আদেশে যোগমায়া প্রকট হয়ে দেবকী ও বাসুদেবের মন থেকে বিষ্ণুর দর্শন লাভ এবং তাঁদের পূর্বজন্মের স্মৃতি মুছে দেন। যোগমায়ার প্রভাবে সে সময় শেষনাগ বলরাম রূপে রোহিণীর গর্ভস্থ হন। বলরামের পর কৃষ্ণের জন্ম হয়। এই খবর পাওয়ার পরই কংস বালক কৃষ্ণের হত্যা করতে বেরিয়ে পড়েন। এটি দেখেই নিজের মায়ায় বাসুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করেন যোগমায়া।

৫. বাসুদেব জাগলে যোগমায়া তাঁকে কংস আসার আগে সেখান থেকে শিশুকে নিয়ে গোকুল চলে যেতে বলেন। বাসুদেব বালককে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার উপায় জিগ্যেস করেন। কারণ সে সময় বাসুদেবের হাতে শিকল ছিল এবং কড়া পাহারার মধ্যে দিন কাটছিল তাঁর। যোগমায়া তাঁকে স্বাধীনতার বিষয় আশ্বস্ত করেন। গোকুল গিয়ে যশোদার কাছে নবজাতক পুত্রকে রেখে, সেখান থেকে নবজাতক কন্যা তুলে আনার কথা বলেন তিনি।

৬. যোগমায়ার প্রভাবে সমস্ত পাহারাদাররা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বাসুদেবের শিকলও খুলে যায়। তার পর শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সে সময় বৃষ্টি ও ঝড় ছিল। যমুনার কাছে পৌঁছলে একটি ঝুরিতে কৃষ্ণকে শুইয়ে দেন এবং হেঁটে যমুনা পার করতে শুরু করেন। তীব্র বৃষ্টি ও ঝরের কারণে গলা পর্যন্ত ডুবে যান বাসুদেব। তখন শেষনাগ বালক কৃষ্ণের সাহায্যের জন্য সেখানে উপস্থিত হন।

৭. সে সময় যমুনা প্রকট হয়ে কৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করে নীচে নেমে যান এবং বাসুদেবের জন্য যমুনা পার করার পথ তৈরি করে দেন, বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে অনন্তনাগ ফণাবিস্তার করে ছত্র ধরেন শ্রীকৃষ্ণের ওপরে ।

৮. রাতের অন্ধকারে গোকুলে যশোদার কাছে পৌঁছন বাসুদেব। সেখানে নবজাতক কৃষ্ণকে শুইয়ে দিয়ে সেখান থেকে কন্যা সন্তানকে তুলে কারাগৃহে ফিরে আসেন। তার পর দেবকীর কাছে ওই বালিকাকে শুইয়ে দেন। যোগমায়া প্রকট হয়ে তাঁকে শিকল পরিয়ে দেন এবং যোগমায়ার মায়ায় সেই রাতের সমস্ত স্মৃতি মুছে যায়। আবার যোগমায়ার মায়ায় নন্দরায় বুঝে যান যে, বাসুদেব ও যশোদার পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে।

৯. দেবকীর প্রসব সম্পর্কে জানার পর কংস সেই নবজাতককে বধ করার জন্য কারাগৃহে পৌঁছন। কারাগৃহে পৌঁছে কংস কন্যা সন্তান দেখে বলেন, আকাশবাণী মিথ্যা হতে পারে না, অষ্টম পুত্রের কথা বলা হয়েছিল। বাসুদেব তাঁকে জানান, ঘুম ভাঙার পর তিনি কন্যা সন্তানই দেখেন।

১০. এটি শুনে কংস ভাবেন, তাঁর মতিভ্রম ঘটানোর জন্য বিষ্ণু ষড়যন্ত্র করেছেন। এর পর ক্ষুব্ধ কংস দেবকীর হাত থেকে ওই মেয়েটিকে ছিনিয়ে নেন এবং মেঝেতে ছুঁড়ে মারেন। তাঁর হাত থেকে ছিটকে আকাশে চলে যায় ওই কন্যা এবং যোগমায়া প্রকট হন। ভীত কংসকে যোগমায়া জানান যে, তাঁকে যে বধ করবে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নিয়েছে,

“তোমারে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।”

দেবকীকে কষ্ট না-দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে সেখান থেকে অদৃশ্য হন যোগমায়া।

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১১॥

শ্রীকৃষ্ণের ননীর চুরির অর্থ:-

চিৎ চোরা যশোদাকে লাল
নবনীত চোরা গোপাল,
গোপাল, গোপাল,
গোবর্ধনধারী গোপাল।

কৃষ্ণের ননী চুরির অর্থ পূরাণে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকার দেওয়া রয়েছে। এক জায়গায় বলা হচ্ছে, কৃষ্ণ সবসময় সাদা বা নির্ভেজাল হৃদয় চুরি করত। মাখন বা ননীর রঙ যেমন সাদা বা শুভ্র, আমাদের হৃদয়ও তেমনই দাগহীন, নির্ভেজাল, স্বচ্ছ্ব হওয়া প্রয়োজন। হৃদয় থেকে রাগ, অহঙ্কার, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ,লোভ, অহং প্রভৃতি দূর করা উচিৎ।

আর এক জায়গায় বলা আছে যে, আমাদের মন ননীর থেকেও হালকা হওয়া উচিৎ । ননী যেমন জলে ভাসে, আমাদের মনও ততটাই হালকা হওয়া উচিৎ, মালিন্যমুক্ত, ক্লেদবর্জিত, আকাঙ্খারহিত, বাসনাশূন্য, তবেই কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তি হবে।

ভগবানকে কেন বিভিন্ন নামে ডাকা হয় এবং তাঁর এই নাম ধারনের বিশেষত্ব কি?
ব্রহ্মসংহিতায় প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে:

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

ভগবান:- তিনি ষড়ৈশ্বর্য পূর্ন,তাই তাঁর নাম ভগবান।

কৃষ্ণ :- কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হল সর্বাকর্ষক। তিনি সকলকে আকর্ষন করেন।তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ ।

গোবিন্দ:- তিনি গাভী ও ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দান করেন বলে তাঁর নাম গোবিন্দ।

গোপাল:- তিনি গো(গরু)পালন করেন বিধায় তাঁর নাম গোপাল।

মুকুন্দ:- তিনি সকলকে মুক্তি দান করেন বলে তাঁর নাম মুকুন্দ।

মাধব:-তিনি সকলকে কৃপা করেন বলে তাঁর নাম মাধব।

হৃষিকেশ:- তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ও পরিচালক। তাই তাঁর নাম হৃষিকেশ।

মধুসুদন:- মধু নামক দানবকে হত্যা করেছেন বলে তাঁর নাম মধুসুদন।

কেশিনী সুদন:- কেশি নামক দানবকে হত্যা করেছেন বলে তাঁর নাম কেশিনীসুদন।

বংশীধারী:- তিনি হাতে বংশী ধারন করে আছেন বলে তাঁর নাম বংশীধারী।
পার্থসারথী:- তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি(চালক)হয়েছিলেন বলে তিনি পার্থসারথি ।

জগন্নাথ:- তিনি জগতের নাথ ও জীবের করুনার সাগর,তাই তিনি জগন্নাথ।

গিরিধারী:- তিনি বৃন্দাবনে গিরিগোবর্ধন পর্বত ৭ দিন ৭ রাত্র কনিষ্ঠা আঙ্গুলের উপর রেখেছিলেন বলে তাঁর নাম গিরিধারী।

মদনমোহন:-তাঁর রুপ দর্শনে সকলে মোহিত হন বলে তাঁর নাম মদনমোহন।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ:- তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করে রেখেছিলেন বলে তাঁর নাম ক্ষীর চোরা গোপীনাথ।

জনার্দন:- তিনি সমস্ত জীবের প্রতিপালক,তাই তিনি জনার্দন।

বিষ্ণু:- তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা,তাই তিনি বিষ্ণু।

BAN COM

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১২॥

কেন ময়ূরের পেখম শিখিপাখা কৃষ্ণের শিরে শোভা পায়?

"হৃদিপদ্মে চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম
বাঁকা শিখিপাখা নয়ন বাঁকা বঙ্কিম ঠাম।"

একদিন বড়ই মনোরম এক পরিবেশে, শ্রীকৃষ্ণ ও বাকি রাখালরা দুপুরে জঙ্গলে ঘুমোচ্ছিলেন। কৃষ্ণ সবার আগে ঘুম থেকে ওঠে ও এই অপূর্ব পরিবেশে নিজের মনে বাশি বাজাতে শুরু করেন। অপূর্ব, মনোরম সেই সুর। ওনার এই মিষ্টি সুরে সব প্রাণী উচ্ছসিত হয়ে নাচতে শুরু করে দেয়। এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একদল ময়ূরও ছিল। তাদের মধ্যে কিছু আবার সুরে মুগ্ধ হয়ে বিভোর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বংশীবাদন যখন বন্ধ হয়, তখন ময়ূররাজ শ্রীকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে আসেন। ওর সব পালক ঝরে পড়ে। ভগবান কৃষ্ণকে এই সব পেখমগুলো গুরুদক্ষিণা হিসেবে দান করা হয়। ভগবান কৃষ্ণ এই উপহার খুব আনন্দের সাথে স্বীকার করেন ও মাথায় সেগুলো ধারণ করেন।উনি এই সময়ই জানান, যে উনি এই পালক চিরকাল পরবেন এবং অন্য কোন প্রাণীর পালক এই স্থান নিতে পারবে না কোনদিন।

সাতটি রঙ:

বলা হয় প্রাথমিক সাতটি রঙের সব কটাই ময়ূরের পেখমে থাকে। তাই মানা হয় শ্রীকৃষ্ণ এটি পরিধান করে জীবনের সব রঙ ধারণ করার প্রতীক হন। ভগবান কৃষ্ণ সারা বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, তাঁর অপার লীলা ও মহিমায় আমরা আচ্ছন্ন। ওনার নানা রূপ,নানান দর্শন ও ব্যক্তিত্ব আমাদের মোহিত করে রাখে।এছাড়াও রামধনুর সাতটি রংই ময়ূরের পেখম থাকে যা আমাদের দেহের বিভিন্ন চক্রের রং।বেনীআসহকলা ওই সাতটি রং, বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল।মানুষের শরীরের ছটা চক্র আর সহস্রার এই সাত চক্রেরও সাতটা আলাদা আলাদা রং আছে আর এক একটা রং বোঝায় একটা একটা তত্ত্ব। যেমন:

মূলাধারচক্রের পদ্মের বর্ণ লাল-এটা পৃথ্বী বা ক্ষিতি তত্ত্ব।

স্বাধীষ্ঠানচক্রের পদ্মের বর্ণ কমলা-এটা অপ বা জল তত্ত্ব।

মণিপুরচক্রের পদ্মের বর্ণ হলুদ-এটি তেজতত্ত্ব, হৃদপিন্ডের কাছে স্থিত অনাহত চক্রের পদ্মের বর্ণ হাল্কা সবুজ, বিশুদ্ধচক্র পদ্মের বর্ণ আসমানি বা হাল্কা নীল।

আজ্ঞাচক্রের পদ্মের বর্ণ ঘন নীল আর

সহস্রারের পদ্ম বর্ণ হাল্কা বেগুনি।

এই সাতটি রঙের প্রভাবও মানুষের জীবনে অনেক। এই সাতটা রং একত্রে মিশলে সেটাই কালো বা কৃষ্ণবর্ণ যা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

স্কন্দের শুভাকাঙ্ক্ষী

ভগবান বিষ্ণুকে, দেবী পার্বতীর ভাই হিসেবে মানা হয়। শাস্ত্রে আছে যে বিষ্ণু বিয়ের সম্পর্কে দেবী পার্বতীকে মহাদেবকে দান করে দেন।তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ কার্তিকের মামা হন। শ্রীমান কার্তিকের বাহন হল ময়ূর। তাই মানা হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরের পেখম নিজের মাথায় সাজান যাতে কার্তিক, যিনি আবার যুদ্ধের দেবতা, ওনার সমস্ত প্রয়াস যেন সার্থক হয়।

শ্রীরাম ও ময়ূর

****

ত্রেতা যুগে, ভগবান শ্রীরাম এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। প্রচলিত আছে যে একবার শ্রীরাম ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। একদল ময়ূর নাকি তাদের পেখম দিয়ে ওনার চলার পথটি পরিষ্কার করে দেয়। ভগবান শ্রীরাম নাকি তাদের এই নিঃস্বার্থতা ও নিষ্ঠার নিদর্শনে খুবই প্রসন্ন হন। উনি নাকি তখন কথা দিয়ে যান যে দ্বাপর যুগে উনি আবার আবির্ভূত হবেন ও তখন ময়ূরদের প্রতি সম্মান জানাতে এই পালক উনি মাথায় ধারণ করবেন। তাই উনি যখন শ্রীকৃষ্ণ রূপে ধরায় আবির্ভূত হন, ওনার নিজের দেওয়া কথার সম্মান রাখতে নিজের মাথায় ময়ূরের পালক পরেন।

এছাড়া কথিত আছে যে, প্রাচীন যুগে একসময় ময়ূরের লেজ নিষ্প্রভ ছিল। রাবন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধের সময় ময়ূর তার লেজ বিস্তৃত করে দিয়েছিল, যাতে দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে লুকতে পারেন। নিজের লেজ দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করতে সফল হয়েছিল ময়ূর। এরপর থেকে ময়ূরের পালককে মঙ্গলময় বলে স্বীকৃতি দেব দেবতারা। এবং এরপর থেকেই দেবরাজ ইন্দ্রকে ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট হতে দেখা যায়।

ময়ূরকে ধন-সম্পদের প্রতীক হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। আর এই কারণেই বাড়িতে ধন-সম্পদের বৃদ্ধি করতে অনেকে বাড়িতে ময়ূরের পালক রাখেন। এছাড়াও এমনও মনে করা হয়, ময়ূরের পালক বাড়িতে রাখলে, বাড়িতে মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হয় না।

যেহেতু যুদ্ধের সময় ময়ূর নিজের লেজ দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিল, তাই একে নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়।

ময়ূর আমাদের মনে আনন্দ এবং একাত্মতা নিয়ে আসে। একে গর্বেরও চিহ্ন বলে ধরা হয়। হিন্দু ধর্মে কথিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্রকে একবার পশুর রূপ ধারণ করতে হয়েছিল। তিনি ময়ূরের বেশ ধারণ করেছিলেন। অশুভ শক্তি দূর করার প্রতীক বলে মনে করা হয় ময়ূরের পালককে।

BANGLADARSHAN.COM

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৩॥

উদ্ধব গীতা বা উদ্ধব সন্দেশ:-

"হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে,
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে।"

এই বইটা আমাকে দিয়েছিলেন আমার গুরু মা, যখন দিয়েছিলেন বুঝিনি তেমন, পরে পড়তে বসে বুঝেছি কেন দিলেন তিনি এটা আমাকে। তার কিছু অংশ এখানে চেষ্টা করেছি লিখতে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবনের অন্তিম মহা উপদেশ ভাগবতের একাদশ স্কন্দের সপ্তম অধ্যায় থেকে উনত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এই ২৩টি অধ্যায়কে "উদ্ধব গীতা" বলা হয়।ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন উদ্ভব। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোলক ধামে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত ভক্তের মনোকামনা পূর্ণ করছেন। কিন্তু শুধু উদ্ভব ছিলেন নীরব আসক্তিহীন। উদ্ভব কিছু চাইছে না দেখে ভগবান তাকে কিছু চাইতে বললেন।

BANGLADARSHAN.COM

উদ্ভব বলল, "প্রভু আমি তো আপনার কাছ থেকে কোনদিন কিছু চাইনি তবে আজ কেন চাইব? ভগবান বললেন উদ্ভব আজ তুমি না চাইলেও আমি তোমাকে কিছু দেব। না দিলে অবিচার হবে।"

উদ্ভব বলল, "বেশ তো যদি কিছু দিতেই চান তবে আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"কি প্রশ্ন বলো উদ্ভব? আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেব।" উদ্ভব বলল "প্রভু আপনি তো পাণ্ডবদের পরম মিত্র ছিলেন তবুও তাদের সবথেকে বড় বিপদে আপনি তাদের পাশে কেন থাকেন নি? আপনি তো দীনবন্ধু। আপনার পরম মিত্রদের পাশে দাঁড়ালে হয়তো কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আপনি আটকে দিতে পারতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন পাশা খেলায় হেরে যাচ্ছিলেন তখন আপনি কেন যাননি তাঁকে সাহায্য করতে? আপনি কেন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে বাধা দিলেন না?"

এই প্রশ্ন শুনে ভগবান বললেন "উদ্ভব আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব তবে তার আগে তোমাকে জানতে হবে ভক্ত, ভগবান ও বন্ধুত্ব পালনের কিছু নিয়ম।"

যখন কোন ভক্ত আমাকে বন্ধু বলে ভাবে তখন সে মনে করে আমি তার সাথে সর্বদা থাকি। তখন সেই ভক্ত তার সব কাজের সাক্ষী মানে আমাকে। আমাকে সাক্ষী করলে কখনও কোন ভক্ত কোন খারাপ কর্ম করতেই পারে না। কারণ আমি তার সাথে সর্বদা থেকে তাকে কুকর্ম থেকে বিরত রাখি। কিন্তু যখন সেই ভক্ত আমার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে অহংকারের ফলে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে তখন আমি নিরুপায় হয়ে যাই। আমার থেকে দুরত্ব বাড়লেই তখন সে পাপ করতে শুরু করে। অহংকারের প্রাচীর তুলে সে তখন আমাকে আড়াল করে রাখে।

অসহায়ের মত দেখা ছাড়া আমার কিছুই করার থাকে না। কারণ মানুষের কর্মের ওপর ভগবানের কোন অধিকার নেই। এটাই জগতের নিয়ম। মানুষ স্বাধীন জীব। শুধু মানুষ কেন জগতের সমস্ত জীবই স্বাধীন। মানুষ তো আরও স্বতন্ত্র। তার বিবেক, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব আছে। তাই তার স্বাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ ভগবান ও করতে পারেন না। মোহ, মায়া ও অহংকারের বশীভূত হয়ে বাসনাসক্ত মানুষ পাপের বোঝা বাড়িয়ে চলে।

এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব উদ্ভব। যুধিষ্ঠির যখন পাশা খেলার জন্য শকুনির আমন্ত্রণ গ্রহণ করল তখন সে আমাকে জানায় নি। কারণ সে জানত পাশা খেলায় আমি বাধা দেব। যখন আমি জানতে পারলাম সেই কথা তখন সে আমাকে দিব্যি দিয়ে আমাকে অসহায় করে দিল। যুধিষ্ঠির অহংকার ও অতি আত্মবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে পাশা খেলতে গেল। যুধিষ্ঠির আমাকে দ্যূত ক্রীড়াস্থলে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিল। ভাবো তো উদ্ভব যদি শকূনির সাথে আমি পাশা খেলতাম তাহলে খেলার পরিণাম কি হতো? পঞ্চপাণ্ডব কি সব কিছু হারিয়ে নিলামে উঠত? দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কি হতো?

দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কক্ষে গিয়ে তাকে অপমান করতে লাগল, তার কেশ আকর্ষণ করে তাকে সভাকক্ষে টেনে নিয়ে এল তখনও দ্রৌপদী আমাকে ডাকেনি। আমার কথা তখন তার মনেই ছিল না। যখন শেষ মুহূর্তে সম্মান রক্ষার জন্য এক ফালি বস্ত্র অঙ্গে ছিল না তখন সে আমাকে স্মরণ করল। আমার প্রিয় সখী আমাকে স্মরণ করছে এক্কেবারে শেষ মুহূর্তে। ডাকা মাত্রই আমি দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তার সম্মান রক্ষা করেছি।

BANGLADARSHAN.COM

অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব যখন তারা সবাই দুর্যোধনের কাছে নিলাম হয়ে যাচ্ছিল তখন তারা কেউ আমাকে সাহায্যের জন্য ডাকেনি। দ্রৌপদীর স্মরণ মাত্রই আমি দীনবন্ধুর মত সূক্ষ্ম শরীরে হাজির হয়ে তাকে সাহায্য করেছিলাম উদ্ভব। তাহলে এবার বল আমার দোষ কোথায়?”

উদ্ভব বলল “আমি বুঝেছি প্রভু। আপনাকে বিস্মরণ করা মানে হল আমার মরণ। তাই প্রভু আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন আমি যেন এক মুহূর্ত আপনাকে না ভুলে যাই।”

ভগবান আশীর্বাদ করে বললেন “তথাস্তু।” শ্রী কৃষ্ণ আরও বললেন “উদ্ভব তোমার আর আমার এই কথোপকথন পৃথিবীতে উদ্ভব গীতা নামে অমর হয়ে থাকবে। অমর হয়ে থাকবে তোমার নাম ও।”

প্রিয় সখা উদ্ধবকে দেওয়া উপদেশের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–হে উদ্ধব, তুমি স্বজন বন্ধুদের প্রতি সম্পূর্ন স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক আমাতে সম্যকভাবে মনকে আবিষ্ট করে সমদৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ কর।ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সংযত করে যোগযুক্তচিত্ত হয়ে এই জগৎকে আত্মাতে (অবিদ্যার দ্বারা) প্রসারিত দেখ। জগদধিষ্ঠান আত্মাকে জগদীশ্বর আমাকে দর্শন কর। অর্থাৎ আত্মাকে ব্রহ্মরুপে অনুভব কর।

তত্ত্ববিচারের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করা যায় – এ বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন – "হে উদ্ধব, এই সংসারে যে মনুষ্য এই জগৎটা কি, এতে কি কি ব্যাপার ঘটছে, কেন ঘটছে, কে ঘটাচ্ছে ইত্যাদি তত্ত্বের বিচার করতে নিপুন, তিনি চিত্তে বাসা বেঁধে থাকা অশুভ বাসনা থেকে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

সমস্ত প্রানিগনের মধ্যে বিশেষ করে মানুষের অন্তরাত্মাই জীবের হিত এবং অহিতের উপদেশক গুরু। কেননা, মানুষ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারা নিজের হিত-অহিতের নির্নয় করতে সর্বতোভাবে সমর্থ।

হে উদ্ধব, শরীরধারিগনের মুক্তিকারিনী আত্মবিদ্যা এবং বন্ধনকারিনী অবিদ্যা, এই উভয়ই আমার মায়ার দ্বারা রচিত অনাদিসিদ্ব আমার দুইরূপ।

হে মহামতি উদ্ধব, আমার অংশরূপ জীব অনেক নয়, একই। এর অনাদি অবিদ্যার দ্বারা বন্ধন এবং তেমনি বিদ্যার দ্বারা মুক্তি ব্যবহারদৃষ্টিতে স্বীকার করা হয়।

অন্ধ বুদ্ধি মনুষ্যেরা এই মনোকল্পিত শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' মনে করে এই আমি আর এটা অন্য – এইরূপ ভ্রমবশতঃ অনন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে ইতস্ততঃ ভ্রমন করতে থাকে। অদ্বিতীয় পরমাত্মা থেকে মায়ার দ্বারা সকল দ্বৈতের উদয়, আবার তাতেই পুনঃ লয় হয়। এইরূপ অনুসন্ধানের দ্বারা ভেদভ্রম নষ্ট হয়।

BANGLADARSHAN.COM

হে প্রিয় উদ্ধব, বস্তুতঃ সংসারের অস্তিত্ব নেই। তবু যতক্ষন পর্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রানের সঙ্গে আত্মার ভ্রান্তিজনিত সম্বন্ধ আছে, ততদিন অবিবেকী পুরুষের তা সত্যের মত স্ফুরিত হয়।

হে উদ্ধব, অহংকারই (দেহে আমিত্ববোধ) শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা এবং জন্মমৃত্যুর শিকার হয়। আত্মার সঙ্গে এসবের কোন সম্বন্ধ নেই।

হে উদ্ধব, আমাকে লাভ করার যতরকম সাধন আছে, তার মধ্যে আমি মনে করি যে মন, বাণী এবং শরীরের সমস্ত বৃত্তি দ্বারা সমস্ত প্রানীর মধ্যে আমারই ভাবনা করা অর্থাৎ "বাসুদেবঃ সর্বম্" দৃষ্টিতে সবকিছু দেখাই সমীচীন।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা অনন্য এবং খুবই শক্তিশালী, কেননা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং হরিনাম এক ও অভিন্ন, কোন পার্থক্য নেই ।

তথ্যসূত্র : ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর উদ্ধব সন্দেশ।

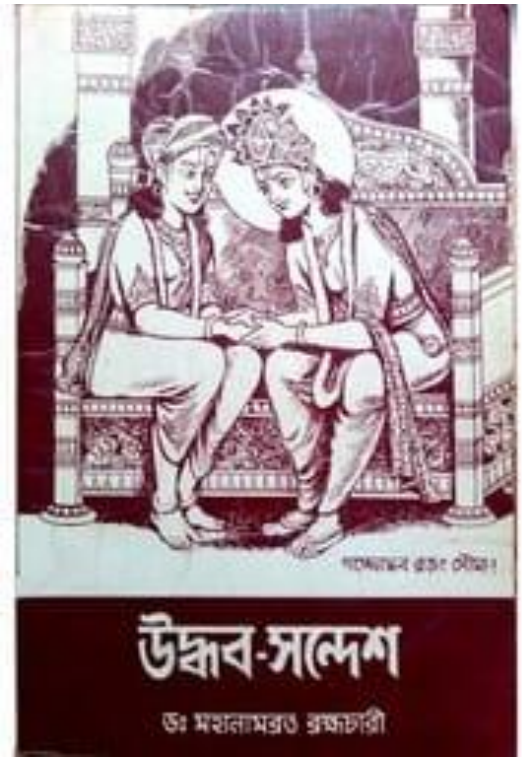

BANGLADARSHAN.COM

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৪॥

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি আদ্যাস্তবে বলেছে,

“নিশুম্ভ শুম্ভ মোথিনী মধু কৈটভ ঘাতিনী,
বিষ্ণুভক্তি প্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।”

অর্থাৎ দুর্গা বা আদি শক্তি আদিত্যবরণী বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন জীবের ত্রাণের জন্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা এই উভয় শক্তিই দুর্গা, মহামায়া দুই নামে নানা শাস্ত্রে দেখা যায়। অন্তরঙ্গা শক্তির উপাসনায় কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তির উপাসনায় জড়জাগতিক বৈভব প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

যিনি যা কামনা করবেন তারা সেই শক্তির উপাসনা করবে ।

ধন দাও, যশ দাও, পুত্র দাও, সরকারী চাকুরী দাও, সুন্দরী স্ত্রী দাও, ডিগ্রী পাস, জমিজমা, রাজত্ব, মন্ত্রীত্ব ” – এই রকম কিছু বাসনা নিয়ে দুর্গাপূজা করলে তিনি বহিরঙ্গা মহামায়া রূপে মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু মুক্তি দাও, বললে তখন সব শক্তি বলে এটা আমার হাতে নেই এটা গোবিন্দের। তার স্মরন নেও!

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় উন্মুখ হলে যে শক্তি সহায়তা করেন সেই শক্তিই হন যোগমায়া। যোগযুক্ত হয়ে যোগারূঢ় হওয়ার জন্য পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় হবে মোক্ষপ্রাপ্তি।

আর কৃষ্ণ বহির্মুখ হলে যে শক্তি জড়জাগতিক ভোগ্যবস্তু দিয়ে কৃষ্ণ থেকে ভুলিয়ে রাখতে সহায়তা করেন সেই শক্তিই মহামায়া।

কাত্যায়নী দুর্গারই অন্য নাম। শ্রীবৃন্দাবনের গোপ বালিকাগণ যে কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করেছিলেন। সেইক্ষেত্রে তাদের আরাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করা। অত্যন্ত সম্মানীয়া মহা প্রজ্ঞাবতী শ্রীবৃন্দাদেবীর নির্দেশে গোপবালিকারা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করবার আশায় কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। তিনি সচ্চিদানন্দময় হচ্ছেন পরমেশ্বর পুরুষ। গোপকুমারীগণ কোনও জড় বস্তু বা বদ্ধ জীবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী ব্রত করেননি। তাই সেই শক্তি কাত্যায়নী যোগমায়া।

কৃষ্ণ বিমুখ ব্যক্তিরা জড়জাগতিক সম্পদ উপভোগের উদ্দেশ্যে দুর্গাপূজা করে, সেই দুর্গা হচ্ছেন মহামায়া।

মহামায়ার দেওয়া সম্পদ পরিণামে দুঃখই দান করে। জড়জাগতিক ভোগবাসনার জন্য এই জড় জগৎ থেকে জীব কখনই স্বস্তি লাভ করতে পারে না। মৃত্যুময় ভবচক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তাকে জন্মমৃত্যুর চক্রে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই দুঃখময় জড় জগতে বদ্ধ হয়েই থাকতে হয়।

কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি আকাঙ্ক্ষী হন তবে কৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হয়ে এই মহামায়ার দুঃখ ও উদ্বেগপূর্ণ জড় জগৎ থেকে নিস্কৃতি পেতে পারবেন। এই কথা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে বলেছেন.....

“দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া,
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥” গীতা ৭-১৪

অনুবাদঃ-আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তাকে কেউই সহজে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করে তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।

কিন্তু জগতের অসুর প্রকৃতির মানুষেরা দুর্গা বা কালীকে পরম আরাধ্যা রূপে গ্রহণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ রূপে কল্পনা করে। আবার অনেকে মনে করে কালীপূজা, দুর্গাপূজা আর কৃষ্ণপূজা একই কথা। এই ধরনের লোকেরা “মায়াপহৃত জ্ঞানাঃ” অর্থাৎ #মহামায়া তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অপহরণ করেছেন। কারণ তারা কৃষ্ণের চরণে অপরাধী।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণপূজা করে, তবে তার প্রতি সমস্ত দেব-দেবী প্রসন্ন হন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে ডাল-পাতায় জল দেওয়া বোকার কাজ।

কৃষ্ণভক্তিতে যে অচলা সব দেবদেবী তার বন্ধু।

প্রজাপতি ব্রহ্মা, মহাদেব শিব সর্বদা ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করেন। জন্ম মৃত্যুর ভবচক্র থেকে মুক্তি একমাত্র ভগবান আদি পুরুষ গোবিন্দই দিতে পারেন, কোন দেবদেবী তা দিতে পারেন না।

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয় মম জগদীশ রক্ষ।”

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৫॥

স্বল্পে সন্তুষ্ট যিনি:-

নারদ মুনির গতি সর্বত্র। তাঁর বাহন ঢেঁকি চড়ে তিনি স্বর্গ মর্ত পাতাল করে বেড়ান।

একবার মর্তে এসে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন–"প্রভু এই জগতে কতো রকমের ভক্ত তোমাকে কতো রকম ভাবে ডাকে। কেমন ভাবে ডাকলে তুমি প্রসন্ন হও?"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–"যে যেভাবে ডাকে তাতেই আমি প্রসন্ন হই। কোনো ভক্তের কাছে যদি কিছু দেওয়ার মতো না থাকে তবে সে যদি শুধু একটি তুলসী পত্র দিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে ডাকে তাতেও আমি প্রসন্ন হই।"

তখন নারদ মুনি বললেন–"কারো কাছে যদি তুলসী পত্র না থাকে তাহলে সে কি দিয়ে ডাকবে?"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানালেন–"যদি তুলসী পত্র না থাকে তবে সে যদি একটি ফুল দিয়ে আমায় ডাকে তাতেও আমি প্রসন্ন হই।"

নারদ মুনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন–"কারো কাছে যদি ফুল না থাকে তাহলে সে কি দিয়ে ডাকবে তোমায়?"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুশি মনে বললেন–"যদি ফুল না থাকে তাহলে সে যেন আমাকে এক গ্লাস গঙ্গা জল দিয়ে ডাকে তাতেও আমি প্রসন্ন হবো।"

তখন নারদ মুনি শান্ত মনে বললেন–"আচ্ছা প্রভু যদি কারো কাছে গঙ্গা জল না থাকে তাহলে সে তোমায় কি দিয়ে ডাকবে?"

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রসন্ন হয়ে বললেন–"যদি গঙ্গা জল না থাকে তাতে কোনো চিন্তা নেই। আমি তো সকল জীবকে দুটি নয়ন দিয়েছি। যদি কোনো ভক্ত দুফোঁটা নয়ন জল আমার শ্রীপাদপদ্মে দিয়ে ডাকে তার কাছে আমি বাঁধা পড়ে যাই। ভক্তি আর প্রেম দিয়ে যে আমারে চায়, সে আমারে পায়।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এমন কথা শুনে নারদ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন–"তোমার দয়ার তুলনা নেই দয়াময়।"

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভক্তকে পরীক্ষা

****

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক ভক্ত ছিল। সে বহু বছর ধরে ভক্তি সহকারে ভাগবত পাঠ করতো। একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক করলেন যে তিনি ভক্তটির পরীক্ষা নেবেন। একদিন ভক্তটি যখন ভাগবত পাঠ করছিল তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে দেখা দিয়ে বললেন বললেন–

“তুই কি ভাবছিস আমি তোর পাঠে খুশি হচ্ছি? যদি তাই ভেবে থাকিস তবে শোন আমি মোটেও তোর পাঠে প্রসন্ন হইনি। এই কথা জানাতে আমি তোর কাছে এলাম।”
ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে খুশিতে নাচতে লাগল। ভক্তকে নাচতে দেখে ভগবান বললেন–“আমি বললাম যে তোর পাঠে আমি প্রসন্ন হইনি আর তুই কিনা সেই খুশিতে নৃত্য করছিস?”

তখন ভক্ত বলল–“হে প্রভু! তুমি খুশি হয়েছ কি হওনি, এটাতো আমি জানিনা। কিন্তু আমি খুশি এই কারণে যে তুমি আমার পাঠটি মন দিয়ে শুনেছো। আনন্দেই হোক বা বিরক্তিতেই হোক তুমি আমার পাঠ শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছিলে। এটাই তো আমার পরম পাওয়া। আর কি চাই?”

শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন–“আমার পরীক্ষায় তুই উত্তীর্ণ হয়েছিস। আমি মনে করি একজন ভক্তের ভাবনা ঠিক এমনটাই হওয়া উচিত।” এই বলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

কাহিনীটি থেকে এই শিক্ষাই আমরা পেলাম যে, যখনই আমরা পরমাত্মাকে স্মরণ করি তখন এই অনুভূতিটা মনের মধ্যে রাখতে হবে যে তিনি আমাদের ডাক শুনছেন।

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৬॥

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব লাভের ক্ষেত্রে শ্রীরাধিকার:-

ভূমিকা ও বৃন্দাবন তত্ত্ব

****

বৈষ্ণব তত্ত্বে রাধাকে ‘শ্রীরাধিকা’ বলা হয়। কিন্তু রাধার আগে কেন 'শ্রী' যোগ করা হয়? কারণ রাধা নারীও নন, পুরুষও নন, তিনি শক্তি বা মহাভাব। অনেকেই বুঝতে পারে যে তাদের মধ্যে কিছু একটার অভাব আছে। এই অভাববোধের অনুভূতিই তার জীবনের আশীর্বাদ, এটাই জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ। আমরা যতক্ষণ এই অভাব বুঝতে পারিনা, যখন আমাদের মনে হয় আমরা খেয়ে পরে বেশ আছি ততক্ষণ আমাদের উপর ঈশ্বরের কৃপা হয়না। কিন্তু যার মনে হয় সে কষ্টে আছে, তার অভাব আছে, যেন জীবন এক শূন্যতা, তার জীবনে তখন থেকেই যাত্রা শুরু হয়ে যায়।

কারণ সেই অভাব মেটানোর জন্য সে কিছু একটা করতে চেষ্টা করবে, সে কোন সাধু বা গুরুর সাহায্য নিয়ে সত্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। গুরুর সংস্পর্শে এলে তিনি তাকে স্বভাবের পথ দেখিয়ে দেবেন। এভাবে অভাব থেকে স্ব-ভাবের দিকে তার যাত্রা শুরু হবে। আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাব আছে। এই জগতে কেউ কারুর মতো নয়, প্রত্যেকে আলাদা বলেই এত ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর রূপ আছে। গুরুর কাছ থেকে পথ চিনে নিয়ে মানুষ নিজের স্বভাব অনুযায়ী চলতে শুরু করে। স্বভাব অনুযায়ী চললেই তার দ্রুত উন্নতি হবে, তাই গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরাধর্ম ভয়াবহ।” স্বধর্ম পালন করতে করতে মৃত্যু হলেও ভালো, কিন্তু কোন মতে পরের ধর্ম গ্রহণ কোরো না। এখানে স্বধর্ম মানে স্বভাব।

নিজের স্বভাব যদি বৈষ্ণবের হয়, আর তাকে যদি জোর করে শাক্তের মন্ত্র দেওয়া হয় তাহলে নিজের প্রতি অধর্ম করা হবে। মানুষ নিজে নিজের স্বভাব বুঝতে পারে না বলেই গুরুর সাহায্য নিতে হয়। গুরু তার স্বভাব চিনে নিয়ে দীক্ষা দেন, তাকে সাধনার পথ বলে দেন ও এগিয়ে চলার শিক্ষা দেন। নিজের মধ্যে যত স্বভাব জাগবে ততো ভগবানের সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে এবং সেই অনুযায়ী আপনার ভাব তৈরি হবে। যেমন কেউ হয়তো মনে করেন তিনি পিতা আমি তার সন্তান, তিনি প্রভু আমি দাস, তিনি লীলাময় আমি দ্রষ্টা, তিনি আমার বন্ধু, আমার মা, অথবা আমি তাঁর প্রেমিক। বৈষ্ণব পরম্পরা ভগবানের সাথে ভক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতেই পাঁচ রকমের ভাব আছে–শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

শান্ত ভাব হচ্ছে ঋষিদের ভাব, ঋষিরা দ্রষ্টার মত ভগবানের লীলা দেখেন। বৃন্দাবনের অনেক প্রাচীন গাছ ভগবানের লীলা দেখার জন্য বৃক্ষ শরীর নিয়েছিলেন। তাঁরা লীলায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি। এটা শান্তভাবের উদাহরণ।

হনুমানের ছিল দাস ভাব। দাস ভাবে যার হৃদয় ইষ্ট-পূর্ণ সে মানুষ হিসাবে পূর্ণ। এমনিতে আমরা দাস ভাব বলতে দুর্বলতা ও হীনতা বুঝি। কিন্তু আসলে দাস ভাবের মধ্যে গৌরব আছে, 'আমি দাস তুমি প্রভু, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো'–এরকম হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট প্রত্যয় থাকলে সেটাই দাস ভাব। দাস ভাবে প্রভুর প্রতি কোনো বিচার থাকেনা, সদগুরু যদি বলেন 'মরা গাছে জল দে' তাহলে ভক্ত তাই করে যাবে, সে বিচার করবে না যে এটাতে জল দিয়ে কি হচ্ছে? মরা গাছটা তো বাঁচবে না। সে জানে গাছ বাঁচানোর জন্য তিনি জল দিতে বলেননি, তিনি আমার কল্যাণের জন্য জল দিতে বলেছেন। এই বিশ্বাস অটুট থাকলে সেটাই দাস ভাব। দাসভাবের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি আছে, সমাজে যত terrorist বা সন্ত্রাসবাদী তৈরি হয় সবাই এই দাস ভাব থেকেই তৈরি হয়। যখন কেউ বন্দুক নিয়ে আরেক জনকে গুলি করে মারে তখন সে ভাবে 'আমি আমার মৌলবীর দাস বা গুরুর দাস। এরপরে আমি বেহেস্তে বা স্বর্গে যাব'–এই চিন্তা করেই সে নিঃসংকোচে গুলি করতে পারে। সুতরাং দাসভাবকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করলে যেমন ক্ষতি হতে পারে, তেমনই দাস ভাবকে ভালোভাবে ব্যবহার করলে একজন হনুমানের মত বীর হতে পারে।

এরপরে আছে সখ্যভাব, যেমন সুদামা ও অর্জুনের মধ্যে ছিল। এরা ভগবানের সাথে সমানে সমানে মেশে, এরা জানে যে তিনি ভগবান, কিন্তু মেশার সময় বন্ধুর মতো মেশে। যেমন অর্জুন ও সুদামা দুজনেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কিন্তু তাঁর সাথে বন্ধুর মত মিশতেন। অর্থাৎ যে সম্পর্কে বহিরঙ্গে বন্ধুত্ব আর অন্তরঙ্গে পূজা সেটাই সখ্যভাব। অনেক সময় মহাপুরুষরা আমাদের সাথে বন্ধুর মতো মেশেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ দত্তকে জিজ্ঞাসা করছেন 'হ্যাঁরে, এটা কি করে করব বল তো?' বা অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করছেন 'হ্যাঁগো আমার হাতে যে ব্যথা করছে, এটা কি করে সারাবো?' এভাবে বন্ধুর মত মিশছেন। কেউ হয়তো বলছে 'চলুন, আপনাকে ভালো ডাক্তার দেখাই।' এটাই ভগবানের লীলা, বন্ধুর মত তিনি মিশছেন বলেই তাঁকে অনেক কাছের মনে হয়। যদিও ভেতরে ভেতরে সকলেই জানে উনি সাক্ষাৎ ভগবান। এই বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে তিনিও রস আস্বাদন করছেন।

এরপর আছে বাৎসল্য ভাব। এটা অত্যন্ত গভীর এক ভাব, এখানে মায়ের স্নেহ দিয়ে ঈশ্বরের পূজা করা হয়। ঈশ্বরকে নিজের শিশু মনে করে মা-সন্তানের সম্পর্ক তৈরি হয়। যশোদা, কৌশল্যা ও শচীমাতা বাৎসল্য ভাবে পূর্ণ ছিলেন। মাতৃত্ব নিয়ে গোপাল ভাবে সাধনা করে তাঁদের ঈশ্বরের জ্ঞান হয়েছিল। যশোদা শিশু কৃষ্ণকে বললেন 'হাঁ কর, দেখি তুই ননী খেয়েছিস কিনা?' কৃষ্ণ হাঁ করলে সেই হাঁ-এর মধ্যে দিয়ে যশোদা চতুর্দশ ভুবন দেখতে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এরপরে মধুর ভাব–এই ভাবে প্রেমিকরূপে ভগবানের ভজনা বা উপাসনা করা হয়। একজন প্রেমিকা যেভাবে প্রেমিককে ভালোবাসে বা একজন প্রেমিক যেভাবে প্রেমিককে ভালোবাসে সেভাবে ভগবানকে ভালোবাসা। কোন ইয়ং ছেলে বা মেয়ে প্রেমে পড়লে বড়রা সেটাকে অনুমোদন দিক বা না দিক তারা মা বাবা পড়াশোনা কেরিয়ার চাকরি সবকিছু ভুলে যায়, তাদের প্রেমটাই সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে। প্রেমে রোমান্টিক আবেগ এত তীব্র হয় যে এই দেখে ঋষিরা বলেছেন যদি এভাবে ভগবানকে ভালোবাসা যায় তাহলে তাঁকে অনেক তাড়াতাড়ি লাভ করা যায়। কিন্তু সকলে এই ভাবের অধিকারী নয়। মধুর ভাবের মধ্যে বাকি চারটে ভাব তো থাকেই সাথে একটা প্রচণ্ড রোমান্টিক আবেগও থাকে। প্রেমিক প্রেমিকারা কখনো শান্তভাবে একে অপরের সাথে থাকে, আবার কখনো দাস্যভাবেও থাকে–তখন হয়তো প্রেমিকা যেন বড় এবং প্রেমিক তার কথা শুনছে, আবার কখনো প্রেমিককে বড়

মনে হয়, যখন প্রেমিকা তার কথা শুনছে। প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে কখনো সখ্যভাবে বন্ধুত্ব থাকে, তখন তারা সব ব্যাপারে একে অপরের সাথে গল্প আলোচনা করে মতবিনিময় করে। এছাড়া মধুরভাবে বাৎসল্যও থাকে–কখনো একজন যেন মায়ের মত সেবা করছে আর অন্যজন বাবার মত অভয় দিচ্ছে, আবার কখনো ঠিক উল্টোটা হচ্ছে। সুতরাং মধুর ভাবে বাকি চারটে ভাব তো থাকেই পাশাপাশি একটা প্রচণ্ড রোমান্টিক আবেগও থাকে। ফলে একমাত্র মধুর ভাবেই সবকটা ভাবের পূর্ণতা হয়ে চির সমাধি হয়। তাই রামানন্দ রায় যখন চৈতন্যদেবকে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের কথা বলছিলেন চৈতন্যদেব বলছিলেন 'এহ বাহ্য, আরও কহ।' শেষে যখন মধুর ভাবের কথা শুনলেন তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। এটা রূপক, এর মধ্যে দিয়ে আমরা ভাবের গল্প পেলাম। এভাবে প্রথম পর্যায়ে ভগবান বা ইষ্টের সাথে জীবের সম্পর্ক তৈরি হলো, হয় তিনি জীবের বাবা, মা, প্রভু, বন্ধু, নইলে প্রেমিক–এভাবে যে কোনো একটা ভাব তৈরি হলো। এরপরে ভাব যখন আরও গভীর ও একমুখী হয় তখন সমস্ত কিছু কৃষ্ণময় হয়ে ওঠে, একে বলা হয় মহাভাব। এই মহাভাবের আরেক নাম শ্রীরাধিকা। এই মহাভাবকে শাক্তমতে বলা হয় কুলকুণ্ডলিনী।

এই মহাভাব জীবের মধ্যেও জাগতে পারে। নিজের মেরুদণ্ডের মধ্যে স্পাইনাল কর্ডের নিচে যেখানে মূলাধার চক্র রয়েছে সেখানে এক সুপ্ত শক্তি রয়েছে, সাধক ছাড়া এই শক্তির হদিশ কেউ জানেনা। এই শক্তি যখন জাগতে শুরু করে তখন বৈষ্ণব মতে তাকেই শ্রীরাধিকার গোপন অভিসার বলা হয়। এই অভিসারের পথ হচ্ছে সুষুম্না। মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলার মাঝে যে প্রধান নাড়ী রয়েছে তাকেই বলা হয় সুষুম্না। এই সুষুম্নার মধ্যে দিয়ে গোপনে মহাভাব ওঠে, তাই বলা হয় গোপী। শরীরের নাড়ীগুলোকে গোপী বলা হয়, আর প্রধানা গোপী হচ্ছেন শ্রীরাধিকা। মানুষের শরীরকে বলা হচ্ছে বৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণ এক আঙুলে যে গোবর্ধন ধারণ করে আছেন সেটা আমাদের ব্রেনের রূপক। ব্রেনের মধ্যে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি আছে সেই শক্তি নিচে দিয়ে নেমে আসে। সেই শক্তি যখন জাগতে শুরু করে তখন সেটাই শ্রীকৃষ্ণের এক আঙুলে গোবর্ধন ধারণ, অর্থাৎ যখন আমাদের চেতনা আজ্ঞাচক্রে স্থির হয়ে যায়। শক্তির উত্থান পতন সম্পর্কেই বলা হয় বলা হয় 'টলে জীব, অটলে শিব।' গোবর্ধন ধারণের ছবিতে দেখবেন ওই পাহাড়ের নিচে সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ধরে আশ্রয় নিয়েছেন, অর্থাৎ শরীরের সমস্ত তত্ত্ব ও নাড়ী, আমাদের কোষকলা সমস্ত কিছু তখন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। এই মহাভাব জাগলে আমাদের শরীরের যে ছটা চক্র রয়েছে সেই চক্রগুলো একে একে ভেদ করতে করতে শক্তি একসময় আজ্ঞাচক্রে পৌঁছায়, তারপর আজ্ঞাচক্রও ভেদ হয়ে যায়। আজ্ঞাচক্র কিন্তু কৃষ্ণের স্থান নয়, ওটা শিবের স্থান।

আজ্ঞাচক্রের পরে আরও ছটি চক্র আছে – অমা, বিন্দু, নির্বাণ, কুমারী, ষোড়শী ও সহস্রার।

আমাদের ব্রেইনকে সহস্রদল পদ্মের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার এক একটা দলে ষোলটা করে পাপড়ি আছে। এরকম সহস্রদল বা একহাজার দল আছে। এই পদ্ম এতদিন ধরে যেন নিম্নমুখী হয়ে মুখ বন্ধ করে ছিল, যেই মহাভাবের শক্তি বা শ্রীরাধিকা সেখানে পৌঁছালেন, পদ্ম ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হতে শুরু করল। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় আমরা ব্রেনের চার থেকে পাঁচ শতাংশ ব্যবহার করতে পারি, আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে ব্রেনের ছয় থেকে সাত শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই ব্রেন এই শক্তিতে একশ শতাংশ খুলে যায়। তাই বলা হয়

তাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায়। জগতের যত বিজ্ঞান আছে, যত রহস্য আছে, যত অতীত ভবিষ্যৎ আছে সবকিছু আমাদের চেতনার মধ্যেই রয়েছে।

কৃষ্ণ যে কদমতলায় বাঁশি বাজাচ্ছেন সেটা আমাদের শরীরের সহস্রার চক্রের প্রতীক। বাঁশির ফুটোগুলো হচ্ছে এক একটা চক্রের প্রতীক, বাঁশির যে ফুটোতে শ্রীকৃষ্ণ মুখ দিয়ে বাজাচ্ছেন সেটাই সহস্রার চক্র। বাঁশিওয়ালার যেখানে আঙুল পড়ে সেখানকার সুর যেমন বেজে ওঠে, তেমনি আমাদের শরীরের ছটি চক্রের যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের আঙুল পড়ছে সেই অনুযায়ী প্রকাশ দেখা দিচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে আছেন, পাশে রাধা। ত্রিভঙ্গ মুরারী মানে চেতনার তিন অবস্থা যথা স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তিতে যিনি নিজেকে জানেন। ধরুন কেউ আপনাকে বলছে 'আমি আত্মা', কিন্তু ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখাকালীন বা সুসুপ্তিতে তার মনে থাকেনা যে সে আত্মা। স্বপ্নের মধ্যে বাঘ দেখে ফেললে আঁতকে উঠে তার ঘুম ভেঙে যাবে, তখন আর তার আত্মার বোধ থাকবে না। কিন্তু জ্ঞান মানে সর্ব অবস্থায় নিজেকে জানা, জাগ্রত অবস্থাতেও সে নিজেকে আত্মা বলে জানে, ঘুমের সময়েও সে জানে যে শরীর ঘুমিয়ে আছে, মন স্বপ্ন দেখছে কিন্তু সে আত্মা, এবং ঘুমের গভীরে স্বপ্নহীন সুসুপ্তির অবস্থাতেও সে নিজেকে আত্মা বলে জানে। সে জানে শরীর, মন, বুদ্ধি সকলে ঘুমোচ্ছে কিন্তু আত্মা চিরজাগ্রত হয়ে আছে। এভাবে যে স্থিতিতে একজন সর্বদা নিজেকে জানেন সেটাই কৃষ্ণ স্থিতি। তিনি সর্ব অবস্থায় ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন।

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ যিনি কর্ষণ করেন। আর গুরুমহারাজ বলতেন 'যে আরাধনা করে তিনিই রাধা।' আমাদের জীবনের ধারা হচ্ছে নিম্নমুখী, আমাদের শক্তি মস্তিষ্ক থেকে নিম্নগামী হয়ে নিম্নদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমাদের চিন্তা নিম্নমুখী তাই আমাদের দৃষ্টি সব সময় নিচের দিকে থাকে। পশুপাখি, গরু, ছাগল সব সময় নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে, মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে, একইভাবে বেশিরভাগ মানুষও নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটে। বিরল কিছু মানুষ আছে যারা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাঁটে। যাদের নিচের দিকে দৃষ্টি তাদের চেতনা নিজের দিকে। জীবনের মূলস্রোত নিম্নমুখী বলেই পাহাড় থেকে নদী নিচের থেকে নেমে এসে সাগরের সাথে মেশে। আমাদেরও একই অবস্থা, আমরাও উপর থেকে নেমে এসে নিচের দিকে চলে যাচ্ছি। জীবনের এই ধারা যখন উল্টে যায় তাকে বাউলরা বলেন উজান স্রোত।

অর্থাৎ যে স্রোত নিচের দিকে নেমে আসছে তার উল্টো দিকে যখন কেউ সাঁতার কাটতে শুরু করে সেই বাউল। সে উজান স্রোত বেয়ে আবার উৎসের দিকে যেখান থেকে জীবন নদীর শুরু হয়েছিল সেখানে ফিরে যাচ্ছে। সুতরাং যার জীবনের ধা-রা উল্টে যায় সেই হয়ে ওঠে রা-ধা। তখনই নিম্নস্রোত দিক পরিবর্তন করে এবং কুণ্ডলিনী শক্তি জেগে গিয়ে যে স্রোত উঠতে শুরু করে তিনিই শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকার গন্তব্য হচ্ছেন কৃষ্ণ আর শ্রীরাধিকার সাথে শ্রীকৃষ্ণের মিলন মানে হচ্ছে সমাধি। সমাধিতেই মানব জীবনের পূর্ণতা, এর জন্যই সকলে জীবন পেয়েছে। নইলে আমরা সকলে শক্তি নষ্ট করেই চলেছি, শ্রীকৃষ্ণ একা একাই বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন কিন্তু কেউ তাঁর বাঁশির সুর শুনতে পাচ্ছে না কারণ আমরা অন্য বাঁশি শুনছি, আমরা কলকারখানার বাঁশি ও মিডিয়ার বাঁশি শুনছি, কৃষ্ণের বাঁশি আর শোনা হয়ে উঠছে না।

জমিতে চাষ করার আগে যেমন কর্ষণ করা হয় তেমনি কৃষ্ণ ক্রমাগত সহস্রার চক্র থেকে সকলকে কর্ষণ করছেন। তাঁরই চিৎ শক্তি, যোগ শক্তি ও মায়া শক্তিতে আমরা মজে আছি। আমরা যে জীবনের টাকাকড়ি ও অ্যাম্বিশনে

আটকে আছি এটাকে বলে মায়া শক্তি। এরই মাঝে যখন মনে হয় একটু কীর্তনের আসরে গিয়ে হরি কথা শুনি, কোন সাধুর কাছে গিয়ে সৎসঙ্গ শুনি, ভগবানকে ডাকার একটু চেষ্টা করি–এটা যোগ শক্তি। এটাও এক ধরনের মায়া, একে বলা হয় যোগমায়া; অর্থাৎ যে মায়া আপনাকে আপনার অন্তরের সাথে যুক্ত করছে। আপনার সাথে এত আলোচনা হচ্ছে এখানে আমার শরীরটাও যেমন মায়া শরীর তেমনি আপনার শরীরটাও মায়া শরীর। এই আলোচনাও মায়া, কিন্তু এই কথাগুলো আপনার মনে প্রভাব ফেলছে যার ফলে আপনি নিজের অন্তরে ঢোকার প্রেরণা পাচ্ছেন। তাই একে যোগমায়া বলা হয়। কিন্তু আমি যদি আপনাকে বলি, 'চলুন দাদা, চারপাশে গিয়ে দেখি কোথাও একটা বাড়ি কেনা যায় কিনা?' তাহলে সেটা মহামায়ার টান। এই মহামায়া হচ্ছেষ কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি, আর যোগমায়া হচ্ছেন কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। অতএব আমরা যখন নিজের মধ্যে ওই মহাভাবকে জাগাতে পারব তখন সকল জাগতিক চাহিদা কেটে গিয়ে আধ্যাত্মিক আনন্দের স্ফূরণ হবে। লোকে জানতে চায় চাহিদা, কামনা ও ক্রোধ কবে যাবে? কোন নির্দিষ্ট দিন বলে তো বোঝানো সম্ভব নয় যে ওই দিন সমস্ত কিছু চলে যাবে। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব শাস্ত্র বলছে, যখন বিরহ অনল জাগবে তখন এগুলো কমে যাবে তাই নিয়ে আর ভাবতে হবে না, ওই আগুনে সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এটাই রাধার বিরহ। রাধার বিরহে চোখের জল পড়ত না, তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হোত। সে এমন ভালোবাসা, এমন মনকেমন যে সবকিছু পুড়ে ছারখার করে দেয়। ভালো-মন্দ, ন্যায় অন্যায়, কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া সবকিছু জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। তাকে পুড়িয়ে শেষ করতে করতে কৃষ্ণের দিকে নিয়ে যায়। 'অভিমানের আমি' বা 'অহং-এর আমি' শেষ হলেই তো তাঁকে পাওয়া যাবে। তাই বলা হয় কৃষ্ণের গন্ধ ছাড়া, কৃষ্ণের স্পর্শ ছাড়া রাধা আর কিছু পান না। তিনি যা কিছুই স্পর্শ করেন মনে হয় কৃষ্ণের স্পর্শ, তিনি যে গন্ধই পান মনে হয় সেটা কৃষ্ণেরই গন্ধ। সাধনার এক অবস্থায় চেতনার এমন দশা হয়। লোকে একেই ভুল করে ভাবে বৃন্দাবনের নায়ক নায়িকা।

বৃন্দাবন তত্ত্ব ভালো করে বুঝলে বুঝতে পারবেন আমাদের সকলের মধ্যেই নিত্য বৃন্দাবন রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, যার মধ্যে সামান্য কামগন্ধ আছে তার বৃন্দাবনে প্রবেশ করার অধিকার আসেনি। সুতরাং সাধারণ মানুষ বৃন্দাবন তত্ত্ব বুঝতে পারবে না। বৃন্দাবনের কথা চিন্তা করলে তাদের নিজেদের সুখ দুঃখের কথা মাথায় আসবে, টিভি সিরিয়ালের নায়ক নায়িকার কথা মনে পড়বে, যেভাবে পেশাধারী কীর্তনীয়ার দল বৃন্দাবনকে নিয়ে চটুল রসিকতা করে সেগুলো মনে পড়বে।

প্রকৃত বৃন্দাবন তত্ত্ব বুঝতে গেলে কোন প্রকৃত বৈষ্ণব সাধকের (যেমন চৈতন্যদেব, ঠাকুর রামকৃষ্ণ) কাছে ছুটে যেতে হবে। চৈতন্যদেবের কখনও অন্তর রাধা বহির কৃষ্ণ ভাব জাগতো, আবার অন্য সময় অন্তর কৃষ্ণ বহির রাধা হোত। এটাই সবিকল্প সমাধি এবং নির্বিকল্প সমাধির যুগপৎ অবস্থা। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা বোঝা অসম্ভব। চৈতন্যদেবের অন্তর যখন রাধাময় হয়ে যেত তখন তিনি সবার কাছে 'আমায় কৃষ্ণ এনে দে' বলে কাঁদতেন, তাঁর কান্না দেখে ভক্তরা বুঝতে পারত না কি করবে। কৃষ্ণ আসবেন বলে তিনি মেয়েদের মত করে সাজতেন, তিনি বারবার জানতে চাইতেন 'কৃষ্ণ কখন আসবেন, তিনি যে বলে গেছেন আসবেন।' তিনি যার তার পায়ে ধরে বলতেন 'আমাকে কৃষ্ণ এনে দে।' কাঁদতে কাঁদতে যখন তিনি এই অবস্থার চরমে চলে যেতেন হঠাৎ ভাবান্তর হয়ে যেত, তিনি তখন স্থির হয়ে গম্ভীর হয়ে যেতেন এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সাথে বসে একটু করে সৎসঙ্গ করতেন ও তাদের মাথায় পা দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। তখন তিনি সাক্ষাৎ ভগবান হয়ে গেছেন, তখন

তাঁর বহির কৃষ্ণ অন্তর রাধা ভাব। পুরুষ মানুষ প্রেমের কথা বেশি বলে না, তাই অন্তরে যখন তাঁর কৃষ্ণ ভাব জাগে গেছে তখন তিনি গম্ভীর স্থির হয়ে যাচ্ছেন। এটাই চৈতন্যদেবের ভাব ছিল।

"কৃষ্ণ নাম সুমিরলে সাধো, কৃষ্ণ নাম সুমিরলে,
কৃষ্ণ প্রাণও কী প্রাণ, কৃষ্ণহী প্রাণারাম,
কৃষ্ণহী হ্যায় শ্রীভগবান।"- শ্রীশ্রী মা সর্বাণী
তথ্যসূত্র : দেবী ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবতম,
জয়দীপ মহারাজের প্রবচন

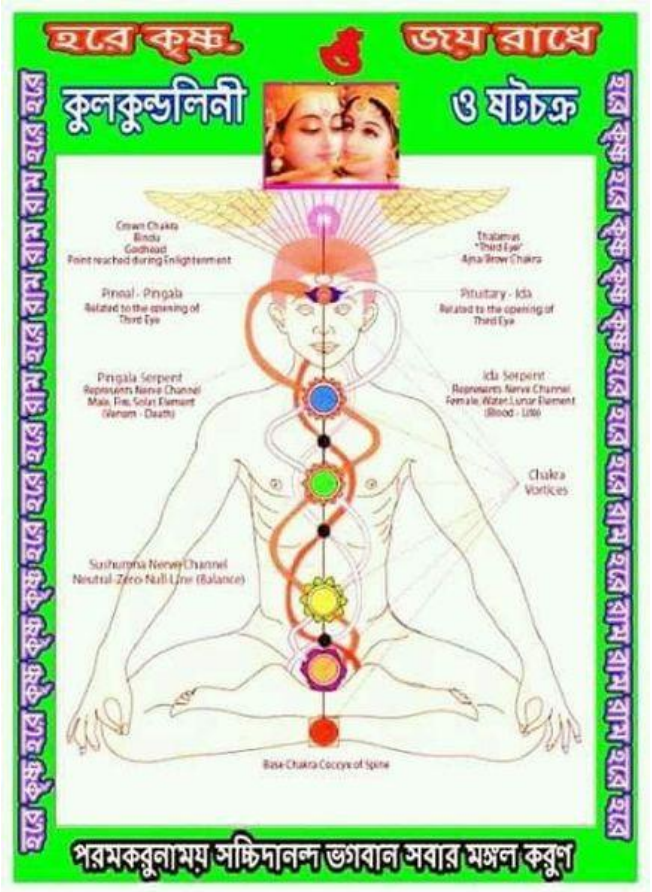

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৭॥

প্রশ্নোত্তর:-

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

এটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অতি পবিত্র বাণী। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ের অর্থাৎ ১৮তম অধ্যায় মোক্ষযোগের ৬৬নং শ্লোকের অংশ এটি।

যাতে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, "হে পার্থ , সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাপন্ন হও।"
এর পরের অংশ-

অহম ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষামি স্বামী মা শূচঃ॥

অর্থাৎ, "আমি সকল প্রকার পাপ হতে তোমায় রক্ষা করব , তুমি শোক করো না।"

লক্ষ্য করবেন-এখানে যে ধর্ম ত্যাগ করবার কথা বলা হয়েছে। তা কিন্তু আপনি যেটা পালন করেন মানে religion সেটি নয়। এখানে ভগবান আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বোঝাচ্ছেন।

যখন আমরা কষ্ট-শোকে জর্জরিত থাকি এবং দিশেহারা হয়ে যাই, আপন কর্তব্যও করতে পারি না, তখন যেন আমরা তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে এই কর্মত্যাগ জনিত পাপ হতে তিনি আমাদের রক্ষা করবেন। তাই পাপের ভয়ে বৃথা শোকগ্রস্থ হওয়া থেকে বিরত হতে বলেছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর, শ্রীকৃষ্ণ কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন- "তুমি ত সব জানতে প্রভু, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমরা আমাদের একশত পুত্র সন্তান হারাবো...তবে কেন তুমি যুদ্ধটা আটকালে না? কি এমন অপরাধের সাজা পেলাম আমরা , যে আজ আমাদের কোল ফাঁকা হয়ে গলো...?" বলে বিলাপ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীরকে দিব্যদৃষ্টি দান করলেন দিলেন ও এক অদ্ভুত ক্ষমতার দিয়ে একশো তিরিশ জন্ম পিছিয়ে নিয়ে গেলেন, যেখানে ধৃতরাষ্ট্র এক দেশের খুবই কর্তব্যপরায়ণ রাজা ছিলেন।

একবার এক হাঁস দম্পতির তাদের ভালোবাসার একশোটা সন্তানদের নিয়ে রাজদরবারে হাজির হন। হাঁস দম্পতি তীর্থ যাবে, তাই তাঁরা তাঁদের সন্তানদের রাজার ছত্রছায়ায় রাখতে চান। রাজাকে এই প্রস্তাব দিতে, রাজা রাজি হন ও হাঁস দম্পতিকে বাচ্চাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। হাঁস দম্পতি বলে যান যে ওরা তীর্থের থেকে ফেরার পথে তাঁদের বাচ্চাদের নিয়ে যাবে।

গতানুগতিক ভাবেই দিন চলে যাচ্ছিল...এর মধ্যে এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় রন্ধনশালার রাঁধুনী কে। তার পক্ষীগৃহে কুক্কুট শেষ।

রাঁধুনী ভাবলো..."মহারাজকে একদিন যদি ওই বাচ্চা হাঁসগুলোর থেকে একটা হাঁসের মাংস খাওয়ানো হয়, মহারাজ বুঝবেন না...কাল বাজার থেকে কুক্কুট নিয়ে আসবো এখন।"
মহারাজকে খাবার দেওয়া হল, মহারাজ বুঝতে পারলেন না..উল্টে রাঁধুনীকে ডেকে রান্নার প্রভুত প্রশংসা করে রোজ এইরকম রান্না করার আদেশ দিলেন। একশো দিনে একশোটা হাঁস খেলেন।

যথাসময়ে হাঁস দম্পতি তাঁদের তীর্থযাত্রা শেষ করে রাজামশাই এর দরবারে নিজের বাচ্চা নিতে হাজির হন। রাজামশাই নির্দিধায় তাঁর লোককে ডেকে হাঁসের বাচ্চাদের ফেরত দিতে বলেন। খবর নিয়ে মহারাজকে জানানো হয় যে বাচ্চাগুলো আর নেই। এত গুলো বাচ্চা নেই..!! খবর নিয়ে যানা যায় যে, একদিন কুক্কুটের অভাবে রাঁধুনী হাঁসের মাংস খাইয়েছিল..মহারাজের ভাল লাগার ফলে, মহারাজের আদেশ অনুযায় এই হাঁসগুলির মাংস খাওয়ানো হয়। এই শুনে মহারাজ খুবই লজ্জিত হন। কথাটা শুনে হাঁস দম্পতি সন্তানশোকে বিলাপ করতে করতে মহারাজকে অভিশাপ দেন..

"আজ শতপুত্র হারানোর যা কষ্ট আমরা পাচ্ছি, একদিন এই সন্তান হারানোর কষ্ট আপনিও পাবেন রাজন...।"
এই বলে হাঁস দম্পতি খালি হাতে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন....।

এই ঘটনা জানার পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বলে, "কিন্ত এই ঘটনায় আমাদের কি দোষ...দোষ ত ওই রাঁধুনীর...।

এই প্রশ্ন শুনে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন.."না মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দোষটা আপনারই ছিল...কারণ যে আপনার শরণে এসেছে, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার..। আপনি কি হাঁস দম্পতির তীর্থ যাওয়ার পর একবারও ওই বাচ্চাদের খবর নিয়েছিলেন..??"

রাজন, সবই মানুষের কর্মফল। যে যা করবে, তাকে ফল ভোগ করতেই হবে..নয় এই জন্মে, নাহলে পরের কোন এক জন্মে।

এটা দৃঢ় সত্য, যে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া একটা পাতা ও নড়েনা।..তবে কর্ম কী গতি নারি....কর্মের গতি বোঝা খুবই দুস্কর...সবটাই সেই কৃষ্ণের ওপরে ছেড়ে তাঁর শরণাগত হয়ে থাকলে তিনিই উদ্ধার করেন।

BANGLADARSHAN.COM

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৮॥

নৌকাবিলাস:-

শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার প্রতিটা লীলার পেছনেই আছে জনমানসের জ্ঞানের চক্ষু উন্মোচিত করার প্রয়াস সে যেভাবেই হোক।

“রাধা” অতি সাধারণ এক গোয়ালা ঘরের বধূ। তাঁর নিত্যকর্মের মধ্যেই পরে দুধ ননী ইত্যাদি দুগ্ধজাত সামগ্রী বৃন্দাবন থেকে মথুরা নগরীতে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করা।একা নয়, দল বেঁধে প্রত্যেক ঘরের বধূরা নিয়মিত খেয়া পার করে যান অন্য পাড়ে। যত শীঘ্র সম্ভব গিয়ে ফিরে আসা।

শ্রীরাধার শ্বাশুড়ি-ননদ ছাড়াও ওই যেসব বধূরা আছেন তাঁরা সবাই এদের প্রণয় সম্বন্ধের কথা জানেন। সম্পূর্ণভাবে না জানলেও আঁচ তো অবশ্যই করেন। লোক চক্ষুর সম্মুখে তাঁরাও প্রচ্ছন্ন থাকেন...একদিনের কথা....শ্রীরাধা অন্য পুরনারীদের সঙ্গে এসেছেন ঘাটে, খেয়া পার করে ওই পারে যেতে হবে। এসে দেখেন সেদিন একটিও নৌকো নেই! মহাবিপদ! কি হবে এখন? বেশি দেরি হয়ে গেলে পসরার সামগ্রী অর্থাৎ দুধ ননী সবতো নষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে উপায়?

এমন সময় দেখা গেল বেশ অনেকটা দূরে একটা নৌকা ভাসছে। এরা তাড়াতাড়ি হাঁক দিয়ে বলে-“ও মাঝি আমরা ঐ পাড়ে যাব দুধ ননী বিক্রি করতে।আমাদের পৌঁছে দাও গো”..

নৌকা এগিয়ে আসে। সবাই অবাক হয়ে দেখে মাঝি আর কেউ নয়, ওদের পাড়ার নন্দ রাজার ছেলে কানাই। আজ ওকে মাঝি রূপে দেখে সকলেই বোঝে নিশ্চয়ই ওর মনে কোনো মতলব আছে। তাও আর তো কোন উপায় নেই! তাই ওর নৌকো কাছে এলে সবাই উঠতে চায়।

কানাই হেসে বলে-“না বাপু; তোমাদের আমি এমনি এমনি পার করে দিতে পারব না। পারানি দিতে হবে”.. মেয়েরা এহেন কথা শুনে যথেষ্ট অবাক হলো, কারণ কানাই তো আর সত্যিকারের মাঝি নয় তাহলে পারানি দিতে হবে কেন? সে যাই হোক ওদের তো তাড়া আছে তাই বলে-“ঠিক আছে তাই নিও, তোমাকে আমরা এক আনা পারানি দেব”...

কানাই হেসে বলে-“উঁহু! সেটি হচ্ছে না। ওই একআনায় হবে না। একা একা আজ অব্দি কিছু হয়েছে নাকি?” মেয়েরা বলেছে এক আনা কানাই ধরেছে একা-নায় অর্থাৎ নৌকা। নৌকা কি একা চালানো যায়? হাল লাগে, দাঁড় লাগে।

এতো জীবন দর্শন! পুরুষ আর প্রকৃতি দুয়ে মিলে সৃষ্টি।

মেয়েরা দেখছে কথার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। তাই একে একে দুই আনা তিন আনা করে শেষে বলে-"আচ্ছা বেশ! তোমাকে চারআনা করেই না হয় দেব। আর গোল বাড়িওনা। রোজ আমরা এই পারানিতে এক পয়সা দুই পয়সা দি, তুমি না হয় চারআনাই নাও"...

কানাই মনে মনে হেসে ভাবে সেই পারানি আর এই পারানিতে তো তফাৎ আছে-মুখে বলে-"চারআনাতে হবে না বাপু! কারণ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গে ফল ধরে না। মানুষ ওতে খালি আবদ্ধ থাকে, কাজেই আমি ওই চার আনা নিয়ে ভোগের ভাগী হতে পারব না"..

দর-কষাকষি করতে করতে পাঁচআনায় পঞ্চেন্দ্রিয়, ছয়আনায় ষড়রিপু, সাতআনায় সাত সমুদ্রের ঢেউয়ের কথায় কানাই বলে–
"ওই ঢেউয়ে ডুবে মরো আর আমি তার দোষী হই?"

মেয়েরা এবার হতাশ হয়ে বলে "আট আনা মানে একটা গোটার আধখানা খন্ডে কি তুমি রাজি হবে?"
কানাই মাথা দুলিয়ে জানায়– "না! তাও হবে না! কারণ আমি নিজেই অখন্ড চৈতন্য স্বরূপ। খন্ড নিইনা। আটআনা মানেতো আ-টানা ওতে তো টানই নেই তাই ওতে আমার কাজ নেই....."

মহা বিপদে পড়ে গোকুল রমণীগণ যখন পুরোপুরি ষোলআনা পারানি দিতে রাজি হলো তখন পূর্ণ হলো তাদের আশ।

ঈশ্বর এমনই! তাঁর প্রতি সমর্পণ যতক্ষণ না ষোল আনা হচ্ছে তিনি কৃপা করার ইচ্ছে রাখলেও এগোতে পারেন না। যেমন হস্তিনাপুরের সেই রাজসভায় যখন দ্রৌপদী লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, প্রায় বিবস্ত্র হতে চলেছেন, সেই সময়ে বস্ত্রের একটা কোনা বুকের কাছে ধরে লজ্জা নিবারণের আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন, আকুল হয়ে কৃষ্ণকে আহ্বান করছেন– "রক্ষা করো হে সখা তোমার সখিকে!! আজ তার লজ্জা-নিবারণ করো প্রভু"..

কৃষ্ণ উপস্থিত সাহায্য করার জন্য কিন্তু পারছেন না। কেন? কারন দ্রৌপদীর ষোলআনা সমর্পণ হয়নি যে। যে মুহূর্তে দুঃশাসনের ভীষণ টানে হাতের মুঠো আলগা হলো আর কৃষ্ণার বুকফাটা হাহাকার এলো "হা কৃষ্ণ!" মুহূর্তে ঢেকে গেল তাঁর শরীর।

কৃষ্ণ মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করব এতো ক্ষমতা আমার নেই। শুধু শোনা গল্পগুলো দিয়ে ভক্তি অর্ঘ্য দানের চেষ্টা সেই ষড় ঐশ্বর্যবান বিরাট পুরুষের মহিমা তাঁরই উদ্দেশ্য আমি আমার মতো করে পরিবেশন করলাম। এই সমর্পণের কথা ঈশ্বর কতভাবেই না বলেছেন..

"ভক্তিপ্রেমের ডালি সাজিয়ে অর্ঘ্য অন্তরের
পূর্ণসমর্পণে এনে পার কর হে হরি জীবের"..
কাজেই পূর্ণ সমর্পণ ছাড়া গতি নেই।

জয় গোবিন্দ জয় গোপাল জয় জয় সনাতন॥

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ১৯॥

ঝুলনযাত্রা:-

শ্রাবণ মাসে একাদশী থেকে পূর্ণিমা, এই পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ঝুলনযাত্রা।

ঝুলনের গান
****

মৃদু মৃদু বংশী বাজে,
নিবিড় পুষ্প কুঞ্জ মাঝে
ভুলে সকল লোক লাজ
অব্যক্ত বন্ধনে বাঁধে শ্যাম,
অন্তরে প্রণয় কুসুমের লহর,
মৃদুমৃদু হাসে স্ফুরিত অধর,
ঢাকে নীল বসনে অম্বর,
চলে রাধিকা অভিসারে নটবর।

BANGL

বংশী ধ্বনি সুরে ডাকে প্রীতম
আমোদিত কুসুম গন্ধে
মুখরিত বিহগ আনন্দে
ভাসে ধরা জ্যোৎস্না চান্দে
বিমল রজতাভ ধরণী,
ভৃঙ্গ মৃদু মন্দ গুঞ্জে
রাশি কুসুম ফুটেছে কুঞ্জে
মেলেছে দল কাননে পুঞ্জে।

যুথি, জুঁই, বকুল অগ্রণী
শ্যামরায় দেখে রাধারানী
প্রেমবারি ছলকে আপনি
মধুর বদন অমৃত নিছনি
চন্দ্রমা শোভা অকিঞ্চন,
এসো হে সজনী এসো সখীবৃন্দ
দুচোখ ভরে দেখি শ্রীগোবিন্দ

গিরিধারী পদারবিন্দ
ত্রিলোক দেব নর করে বন্দন।

ভগবানকে তাঁর সৃষ্টি ও তা রক্ষার জন্য অবতারত্ব গ্রহণ করতে হয়। অবতার রূপে তাঁর নানারূপ কার্যকে যাত্রা বা লীলা নামে অভিহিত করা হয়। ঝুলনযাত্রা তেমনি এক লীলার নাম, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মাধুর্যপূর্ণ প্রেমের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। পরমেশ্বর ভগবান কৃপা করে এই ধরণীতে এই লীলা করেছেন। যাতে করে জীব এই জীবনে জড় জগতে তাঁর সাথে বিশুদ্ধ প্রেমের আদান প্রদানের মাধ্যমে জীবনান্তে ভগবানের সেবায় জীব ভগবদ্ধামে নিজেকে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করতে পারে, সাযুজ্য প্রাপ্তি হয় পরমাত্মার।

ঝুলন হল বর্ষার লীলা যার অপর নাম হিন্দোলনলীলা। ব্রজবাসীরা কদমগাছে ঝুলা বেঁধে রাধাকৃষ্ণকে দোল খাওয়ায়। কাজরী গান হয়। মেঘমল্লারে বৃন্দাবনের আকাশবাতাস সঙ্গীতমুখর হয়ে ওঠে। একাদশী থেকে শুরু হয় ঝুলন আর শেষ হয় পঞ্চমদিনের পূর্ণিমাতে।

ঝুলনযাত্রা রূপকধর্মী। দোলা বা হিন্দোলনের অর্থ হল সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন ময় মানুষের জীবনের প্রকৃত অর্থই হল ঘড়ির পেন্ডুলামের মত চলমানতায় ভরা। একবার আসবে দুঃখ। তারপরেই সুখ। কখনো বিরহ, কখনো মিলন। কখনো আনন্দ, কখনো বিষাদ। স্থির হয়ে থাকাটা জীবন নয়। এই দোলনার আসা ও যাওয়াটি হল রূপকমাত্র। ঝুলনের পিছনের দিকের দোলা মানে ঋণাত্মক গতি সামনের দিকের দোলার অর্থাৎ ধ্বনাত্মক গতির তুলনায় বেশী, অর্থাৎ দুঃখ মানুষের জীবনে বেশী সুখের তুলনায়, মাঝখানে আসে স্থিতাবস্থা যেখানে দোলনা স্থির হয় না, সেটা দোলনে দোদুল্যমানই থাকে। আর ঝুলন বা রাখী পূর্ণিমা হল বন্ধন আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার, শ্রীরাধিকা আরাধিকা জীবাত্মার সঙ্গে পরমপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন বা মিলনে বা সংযোগে সেই দোদুল্যমান অবস্থার পরিসমাপ্তি। তাই জন্যেই তো বলে “চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।”

উপনিষদে বলে “আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যজনাত্” অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। কিন্তু তিনি একা সেই কাজ করবেন কি করে? তাইতো তিনি সৃষ্টি করেন বন্ধু-বান্ধব, পিতামাতা, দাসদাসী, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রীর মত সম্পর্কের জালে আবদ্ধ মানুষদের। তাই প্রেমের আবাহনে পুরুষ আর প্রকৃতির যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠে হিন্দোলন বা ঝুলনের মত উৎসব। সম্পর্ক টিঁকিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রজাপিতা ব্রহ্মের এরূপ দায়বদ্ধতা। মানুষ যাতে মানুষকে নিয়ে অহোরাত্র বেঁচে থাকে.....আর সেখানেই ঝুলন নামক মিলনৎসবের সার্থকতা!

শ্রীমদ্ভাগবতে বলে, বর্ষণমুখর বৃন্দাবন তখন বানভাসি। বর্ষণসিক্ত ধরিত্রী সবুজ। নদীনালা বর্ষার আনন্দে থৈ থৈ। প্রাণীকুল খলখল কলধ্বনিতে মুখর। পক্ষীকুল মনের আনন্দে সরব তাদের কূজনে। আসন্ন পূর্ণিমার রূপোলী জ্যোৎস্নায় ব্যাপ্ত আদিগন্ত চরাচর। এমন প্রাকৃতিক আবাহনে মেতে উঠলেন শ্রীরাধিকা তাঁর দয়িতের সাথে। এতো মানুষের জীবনের মতই মিলনের আর্তি। বহুদিনের অদর্শণের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি।

এ যেন পরাণের সাথে পরাণ বাঁধার উৎসব! চির বন্ধুতার আবেগে মাখোমাখো উৎসব। ঝুলনযাত্রা বহুযুগ আগে থেকে ব্রজভূমি বৃন্দাবনে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা তাঁদের অষ্টসখী [১.ললিতা, ২.বিশাখা, ৩.চিত্রা, ৪.ইন্দুরেখা, ৫.চম্পকলতা, ৬.রঙ্গদেবী, ৭.তুঙ্গবিদ্যা ও ৮.সুদেবী] সহ গোপিনীদের সাথে লীলা করেছিলেন।

রবিঠাকুরের সোনারতরী কাব্যগ্রন্থের “ঝুলন” কবিতার প্রথম ও শেষ লাইনদুটি আজও ঝুলনের দিনে কত প্রাসঙ্গিক-

“আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে,
মরণখেলা, নিশীথবেলা।
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে,
ঝুলনখেলা, নিশীথবেলা।”
“ঝুলত শ্যাম শ্যামা সঙ্গ
নিরখি দম্পতি অঙ্গ শোভা
নাচত অতি আনন্দ।”

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ২০॥

সাধন জগতে মুক্তি প্রকার স্তর:-

একটু অন্যরকম প্রসঙ্গ তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায় বলি:

সাধুর হৃদয়ে ঝুরে নামের মহিমা,
নামের মাহাত্ম্য বর্ণণ নাহি তার সীমা।
একবারে হরিনামে যত পাপ হরে,
জীবের সাধ্য নাই ততো পাপ করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব,
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ।
মালী হইয়া করে সেই বীজ আরোপন,
শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পর ব্যোম পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলোকবৃন্দাবন,
কৃষ্ণ চরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহন।
হরিনাম করিলে না রহে যমভয়
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না রহে সংশয়।-চৈ. চ.

BANGL

সাধন জগতে মুক্তি পাঁচ প্রকার, যা সকলই সৎকর্ম্ম-বিশেষেরই ফল।

এরা হল যথাক্রমে সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও কৈবল্য, যা সাধন জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মানুষের শরীর ও আত্মার ভাব ও কার্য্যের একীভূত ভাবের নাম মুক্তি। মানুষ যখন তার শরীর ও আত্মার ভাব ও কার্য্যে ভেদশুন্য হয়ে একীভূত হয়ে কর্মাদি করতে পারে তখনই মানুষ বিকারমুক্ত হয়। তাদের মন আনন্দময় হয়ে উঠে এবং মুক্তি লাভ করে।

নিজ নিজ গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরসা রেখে উক্ত স্তরগুলোর দিকে এক এক করে এগিয়ে যেতে পারলেই মানুষের জীবন স্বার্থক হয়ে উঠতে পারে।

এবার ছয়টি স্তর সম্পর্কে একটু ধারণা নেয়ার চেষ্টা করা যাক:
•সালোক্য: এইটিকে ঈশ্বরের একলোকে বাসরূপ মুক্তিবিশেষ বোঝায়। অর্থাৎ এটি অভীষ্ট দেবতার নিকটে অবস্থিতি। ঈশ্বর-ইষ্ট দেবতার সঙ্গে বিশেষ যোগাবস্থায় সর্বদা সহবাসের যে বিশেষ জ্ঞান তা হল সালোক্য মুক্তি।

দুঃখ কয়েক ধরনের হয় তার মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ একটি, যা দেহ ও মন থেকে জাত। দুঃখের কারণ আত্মা, তাই এর নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুরকমের হয়। এর একটি হলো শারীরিক, আর অপরটি হলো মানসিক। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ইত্যাদি পীড়াজনিত যে দুঃখ, তা শারীরিক দুঃখ। আর "কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য,ঈর্ষা, ভয়, শোক ইত্যাদি জনিত যে দুঃখ, তা মানসিক দুঃখ। যতক্ষণ না এই দুঃখের অবসান ঘটবে ততক্ষণ সালোক্য মুক্তি সম্ভবই নয়।

•সামীপ্য: সামীপ্য অর্থাৎ অভীষ্ট দেবতার বা পরমাত্মার নিকটে অবস্থিতি। প্রতিনিয়ত ঈশ্বর বা পরমাত্মার সমীপে বিদ্যমানতায় যে স্থিতিজ্ঞান তাহাকেই সামীপ্য মুক্তি বলা যায়।

•সাযুজ্য: এ হল সর্বদা ঈশ্বরে হৃদয়, মন ও শরীরের যোগের অবস্থিতিতে যে জ্ঞান। এক কথায় ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া বা পরমাত্মায় এক হওয়াই হল সাযুজ্য মুক্তিই।

•সারূপ্য: এটি হল 'সকলই তাঁর রূপে দৃঢ় বিশ্বাস ও সর্বদা মনে তারই ভাবযুক্ত জ্ঞান অর্থাৎ সর্বভূতে নারায়ণজ্ঞান হওয়া। এক কথায়, ভগবানের মত রূপ প্রাপ্ত হওয়াই হল "সারূপ্য" মুক্তিই।

•সার্ষ্টি: এটি হল ভগবানের মত ঐশ্বর্যশালী হওয়া বা ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছে এমন ভাবযুক্ত জ্ঞান। এক কথায়, "ভগবানের মত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়াই সার্ষ্টি" মুক্তি।

•কৈবল্য: কৈবল্য বলতে ব্রহ্মত্ব বা মোক্ষলাভ/প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্তি/পরমাত্মার অসঙ্গ অবস্থাকে বোঝায়। কেবল একমাত্র তিনিই সব/সকল, এই ভাবযুক্ত জ্ঞানকে কৈবল্য মুক্তি বলা হয়। একে চিৎশক্তির (চৈতন্যশক্তির) স্বরূপ প্রতিষ্ঠাও বলা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় এই স্তরে:
'প্রকৃতির কার্য ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কার্য নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আত্মবিস্মৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি-বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ হারানো মহিমা ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহারা এই পদচিহ্নহীন জীবনের মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে তিনি অনাদি অনন্ত কাল কার্য করিয়া চলিয়াছেন।'

এটি "জ্ঞান-মুক্তি"র শেষ স্তর, যেখানে সাধকের সমাধি হয়।

মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ,
যাদৃষি ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃষি।

-দৈব অনুগ্রহ মানুষের ওপরে বর্তায় নিজস্ব ধারণা, ভাবনা ও বিশ্বাস অনুযায়ী।

"জয়তু জয়তু কৃষ্ণ নন্দ বংশোপ্রদীপ,

জয়তু জয়তু দেব যদুকুলতিলক,
জয়তু জয়তু শ্যামল মেঘ কোমলাঙ্গ
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভার নাশো মুকুন্দ।”

॥কৃষ্ণময় কৃষ্ণকথা ২১॥

শ্রীকৃষ্ণের ছাপান্ন ভোগ ও সুদর্শন চক্র:-

প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর দিনে শ্রীকৃষ্ণের পূজা মহা আড়ম্বরের সহিত প্রতি কৃষ্ণ মন্দিরেই হয়ে থাকে। পুজোর সময় তাঁকে ছাপান্ন ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। এই ছাপান্ন ভোগ কি, এবং কেন নিবেদন করা হয়, এ সম্বন্ধে পুরাণে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

একবার গোকুলে পর্যাপ্ত মাত্রায় বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল উৎপাদনে সমস্যা দেখা দেয়। তখন গোকুলের ব্রজবাসীরা ইন্দ্র দেবের পূজা অর্চনা শুরু করে দেয় ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কুপিত হন ও বলেন, বৃষ্টি দেওয়া ইন্দ্রদেবের কর্তব্য, তার জন্য তাঁকে কেন তুষ্ট করতে হবে, যদি পূজা করতে হয় তো গোবর্ধন পাহাড়ের করা উচিত, গোবর্ধন পাহাড় আমাদের নানারকম ফল, মূল,শস্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। ইন্দ্রদেব কৃষ্ণের কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে অতিবৃষ্টি করতে লাগলেন। গোকুলে বন্যা আসার উপক্রম হল। শ্রীকৃষ্ণ তখন গোকুলের ব্রজবাসীদের অতিবৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের একটি আঙ্গুলে গোবর্ধন পাহাড় কে তুলে নেন।

ইন্দ্রদেব এতে আরও কুপিত হলেন এবং বৃষ্টিকে আরও তীব্র করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র দেব তার ভুল বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণের লীলা উপলব্ধি করলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ করেছিলেন।

কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ পরপর সাত দিন পর্বত বহন করেছিলেন এবং এই সময় তিনি অন্ন-জল একেবারেই গ্রহণ করেননি। মা যশোদা শ্রী কৃষ্ণ কে অষ্টপ্রহর ভোজন নিবেদন করতেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মাতা যশোদা এবং ব্রজবাসীরা মিলে সাত দিন ও অষ্টপ্রহর হিসেবে ৫৬ ধরনের খাবার প্রস্তুত করে কৃষ্ণের কাছে পরিবেশন করেন। তারপর থেকে প্রত্যেক জন্মাষ্টমীতে তাঁর জন্য ছাপ্পান্ন ধরনের ভোগ প্রস্তুত করা হয়।
আরও একটি কাহিনী ছাপান্ন ভোগ সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। বলা হয় যে শ্রীকৃষ্ণ নাকি একবার রাধার ঐশ্বরিক পদ্মের উপর বসেছিলেন। তাতে ছিল ৩টি স্তর। প্রথমটি ৪টে, দ্বিতীয়টি ২৬টি এবং তৃতীয়টি ৩২টি। সেই মতো শ্রীকৃষ্ণকে ৫৬টি খাবার ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়।

৫৬ ভোগে কী কী থাকে?
ভাত (ভক্ত), ডাল (সুপ), চাটনি (প্রলেহ), কঢ়ী (সদিকা), দই-সব্জির কঢ়ী (দধিশাকজা), সিখরন (সিখরিণী), শরবৎ (অবলেহ), বাটী (বালকা), মোরব্বা (ইক্ষু খেরিণী), শর্করা যুক্ত (ত্রিকোণ), বড়া (বটক), মঠরী (মধু শীর্ষক), ফেনি (ফেণিকা), পুরী বা লুচি (পরিষ্টশ্চ), খজলা (শতপত্র), ঘেওয়ার (সধিদ্রক), মালপুয়া (চক্রাম), চোলা (চিল্ডিকা), জিলিপি (সুধাকুন্ডলিকা), মেসু (ধৃতপূর), রসগোল্লা (বায়ুপূর), চন্দ্রকলা (পগী হুই), মহারায়তা (দই), থুলি (স্থূলী), লবঙ্গপুরী (কর্পূরনাড়ী), খুরমা (খণ্ড মণ্ডল), ডালিয়া (গোধূম), পরিখা, সুফলঢয়া (মৌরী যুক্ত), বিলসারু (দধিরূপ), লাড্ডু (মোদক), শাক, অধানৌ আচার (সৌধান), মোঠ (মণ্ডকা), পায়েস (ক্ষীর), দই, গাওয়া ঘি, মাখন (হৈয়ঙ্গপীনম), মালাই (মড়ূরী), রাবড়ি (কূপিকা), পাপড় (পর্পট), সীরা (শক্তিকা), লস্যি

(লসিকা), সুবত, মোহন (সংঘায়), সুপারি (সুফলা), এলাচ (সিতা), ফল, তাম্বুল, মোহন ভোগ, লবণ, কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল।

ভগবান ও সুদর্শন

****

ঈশ্বর থাকলে তার আয়ুধ থাকবে শিবের ত্রিশূল মা কালীর খড়্গ তেমন বিষ্ণুর ছিল সুদর্শন। যুগে যুগে বিষ্ণুর অবতারের একমাত্র সুদর্শন চক্র প্রাপ্য। তবে রাম অবতারের কথা বললে আমাদের চোখে ধনুর্ধারী রূপটাই ভাসে। রাম নিজের অবতার রূপ ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ নিজে জানতেন তিনি রক্ষাকর্তা নারায়ণ। তিনি জন্মেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। দুষ্কৃতীর বিনাশ করে ধর্ম রাজ্য স্থাপন করবেন।তার শিশু বয়স থেকে ঐশ্বরিক লীলার কথা সবাই জানি। তাই কৃষ্ণর কাছে ছিল সুদর্শন।সুদর্শন চক্র হচ্ছে একটি ধারালো অস্ত্র, যার ১০৮টি ধারালো ধার রয়েছে।

কিভাবে এলো বা কে বানালো এই সুদর্শন? পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ থেকে অগ্নি দ্বারা এই চক্র নির্মাণ করেন। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা হিন্দু দেবতা সূর্যকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু সূর্য্যের প্রচন্ড তাপের জন্য তিনি দেবতা সূর্যের কাছে যেতে পারতেন না। তখন তিনি তার পিতা বিশ্বকর্মার কাছে তার এই অপারগতার কথা জানালেন। তখন বিশ্বকর্মা সূর্যকে হস্তগত করেন এবং তার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করে দেন। যার ফলে সংজ্ঞা সূর্যের কাছে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুর্যের তাপ এবং আলো নষ্ট হওয়ার পর বিশ্বকর্মা কিছু অবশিষ্টাংশ পান। যা দিয়ে তিনি ৩টি পবিত্র দ্রব্য তৈরি করেন। তিনি তিনটি অস্ত্র বানিয়েছিলেন সূর্যের রশ্মি থেকে। সুদর্শন যা বিষ্ণুকে দিয়েছিলেন। ত্রিশূল যার মালিক হলেন মহাদেব ও পুস্পক রথ। আমরা চক্রধারী নারায়নের সুদর্শন চক্র নিয়ে বলি।

হিন্দুপুরাণে সুদর্শন চক্রকে সবথেকে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে উল্ল্যেখ করা হয়েছে। শ্রীবল্লভাচার্য কৃত সুদর্শন কবচ মন্ত্রে বলা হয়েছে , ভগবান বিষ্ণুর হস্তধৃত সুদর্শন চক্র ব্রহ্মাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র, অঘোরাস্ত্র, মৃড়াস্ত্র, যমদণ্ড, কালপাশ আদি সমস্ত ভয়ংকর দিব্যাস্ত্রকে পরাভূত করতে সমর্থ। এই চক্রকে তিনি উগ্র-প্রলয়-কালাগ্নি-রৌদ্র-বীরভদ্রাবতার পূর্ণব্রহ্ম নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

সুদর্শন চক্রটি দেবতা ভগবান বিষ্ণু ব্যবহার করেন। চক্রটি ভগবান বিষ্ণু তার ডান দিকের উপরের হাতে ধারণ করেন এবং তিনি অন্য তিনটি হাতেযথাক্রমে শঙ্খ, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন।

পুরাণ মতে অন্যায়-অশুভ শক্তির দমন এবং শান্তি প্রতিষ্টার জন্য বিষ্ণু সুদর্শন চক্র ব্যবহার করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি চক্রটির মাধ্যমে অনেক অসুর বধের মাধ্যমে স্বর্গ এবং মর্ত্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য মেনে আজও বহু বিষ্ণুমন্দিরের শীর্ষভাগে সুদর্শন চক্রের প্রতীকস্বরূপ একটি ধাতুনির্মিত চক্র বা বলয় স্থাপন করা হয় সকল অশুভ শক্তির হাত থেকে সুরক্ষা পাবার জন্য। এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের চূড়ার নীলচক্রটি।

শব্দোৎপত্তি:-

সুদর্শন শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। সংস্কৃত সু এবং দর্শন শব্দের সমন্বয়ে সুদর্শন শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে সু (सु)অর্থ "ভালো বা মঙ্গল" এবং দর্শন(दर्शन) অর্থ "দৃশ্যমান।" অর্থাৎ সুদর্শন শব্দের অর্থ "মঙ্গলময় দর্শন।"

আবার চক্র শব্দটি সংস্কৃত চো এবং কু এর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এখাএন চো (चृ:) শব্দের অর্থ "চলাচল" এবং কু শব্দের অর্থ সম্পাদন করা। অর্থাৎ, চক্র অর্থ এমন কিছু যা চলাচল করতে সক্ষম। বেদ এবং পুরানে উল্লেখিত দেবতাদের অস্ত্রগুলোর মধ্যে সুদর্শন চক্রই একমাত্র অস্ত্র যা নিজ হতে চলাচল করতে পারে।

পুরাণমতে পরশুরাম চিরঞ্জীবী বা অমর। সত্যযুগ থেকে শুরু করে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেও পরশুরামের উপস্থিতির কাহিনি পাওয়া যায়। ত্রেতাযুগে সীতার স্বয়ংবর সভায় যখন রাম হরধনু ভঙ্গ করে ফেলেন তখন রুষ্ট হয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে মহেন্দ্র পর্বত থেকে সেখানে উপস্থিত হন পরশুরাম।

কিন্তু বিষ্ণুর আর এক অবতার রামের আসল প্রকৃতি জানতে পেরে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন তিনি। সেই সময় রাম তাঁকে সুদর্শন চক্রটি গচ্ছিত রাখতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে দ্বাপর যুগে তিনি যখন আবার জন্ম নেবেন, তখন যেন পরশুরাম সেটি ফিরিয়ে দেন। দ্বাপর যুদে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধরে বিষ্ণু ধরাধামে অবতীর্ণ হলে ধর্ম রক্ষা করার জন্য তাঁকে সুদর্শন চক্রটি ফিরিয়ে দেন পরশুরাম।

অন্য একটি গল্পে পাওয়া যায়, একবার পরশুরামের সঙ্গে গণেশের গোলমাল বাধে। পরশুরাম তাঁর ভয়াবহ রাগের জন্য প্রসিদ্ধ। একবার পরশুরাম কৈলাস যাচ্ছিলেন মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাত্ করতে। পথে তাঁকে গণেশ আটকান। সেই সময় প্রচণ্ড রেগে গিয়ে গণেশকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন পরশুরাম। গণেশ ও পরশুরামের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গণেশের একটি দাঁত কেটে ফেলেন পরশুরাম। সেই থেকে গণেশ একদন্ত নামে পরিচিত।

অতি ভয়ানক এই অস্ত্র যদি নারায়ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রয়োগ করতেন তাহলে একদিনে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যেত। তিনি চেয়েছিলেন ধর্মের জয়। তাই দুই পক্ষের যোদ্ধারা যেন সমান ভাবে শক্তি প্রদর্শন করতে পারে। এই অস্ত্র সময় কে থামিয়ে দিতে পারে। জয়দ্রথ বধের সময় সূর্যকে ঢেকে দিয়েছিলো ক্ষনিকের জন্য এই অস্ত্র!! তাই অর্জুন বধ করতে পেরেছিলেন জয়দ্রথ কে। ভক্তের ভগবান ভক্তের প্রাণ রক্ষা করলেন। আবার সময় কে থামিয়ে দিয়েছিলেন যখন বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, গীতা শুনিয়েছিলেন। দর্শনে ধন্য হয়েছেন পার্থ দেখেছিলেন চক্রধারীর চতুর্ভুজ রূপ। এই চক্র কৃষ্ণের কুন্ডলিনী শক্তি। জনশ্রুতি কৃষ্ণের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই চক্র ভূগর্ভে যেখানে তিনি বসেছিলেন, সেস্থানে বিলীন হয়ে যায়। আবার যদি নারায়ণ অবতার রূপে আসেন তো ওই চক্র আবার শোভা পাবে তার হস্তে। সেই অপেক্ষায় আমরা সবাই আছি।

শ্রী কৃষ্ণ "সুদর্শন চক্র" লাভ করলেন কীভাবে?

-মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১৩ অধ্যায়ে জানা যায় শ্রী কৃষ্ণ হিমালয় পর্ব্বতে দীর্ঘ ১ বছর শিবের আরধানা পূর্বক শিবের দর্শন পান এবং তিনি "সুদর্শন চক্র" লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন-“হে ব্রহ্মাণ শ্রেষ্ট উতঙ্ক সর্বভূতে দয়ালু সেই ধর্মকে আমার প্রিয় বলে জানুন, আমি বর্তমান ও অতীতে মনুষ্য গণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিভিন্ন যোনিতে প্রবেশ করে ধর্মসংস্থাপন করি।”
[মহা.অশ্বামেধিকপর্ব-৬৯/১২,১৩]

“ব্রহ্মান্ডে শ্রেষ্ঠ এখন আমার মনুষ্য রূপ রহিয়াছে, সুতারাং মনুষ্যের ন্যায় কৌরব গণের নিকট দীনভাবে সন্ধির প্রার্থনা করিয়াছিলাম,কিন্তু তারা মোহিত হইয়া আমার সে বাক্য গ্রহণ করেন নাই।”
[মহা.আশ্বমেধিকপর্ব-৬৯/২০]
এই শ্লোক দুটিতে আমরা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি শ্রীকৃষ্ণ যিনি মনুষ্যরূপে এসেছিলেন এবং মনুষ্যের ন্যায়ই আচরণ করতে হয়েছে।

“অহমাত্মা হি লোকনাং বিশ্বেষাং পান্ডুনন্দন
তস্মাদাত্মান মেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম।”

[মহা.শান্তিপর্ব--৩২৭/২২]

অনুবাদ-“শ্রী কৃষ্ণ বললেন পান্ডুনন্দন আমি সমস্ত লোকের জীবাত্মা,অতত্রব আমি প্রথমে আমার আত্মস্বরূপ(নিজের রূপ) রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি।”

BANGLA

“যদ্যহং নার্চ্চিয়েয়ং বৈ ঈশানং বরদং শিবম
আত্মনং নার্চ্চয়েৎ কশ্চিদিতি মে ভাবিতাত্মম"

[মহা.শান্তিপর্ব-৩২৭/২৩]

অনুবাদ-“পান্ডুনন্দন আমি যদি বরদাতা ও ঈশ্বর শিবের পূজা না করি, তাহা হইলে কেহই আমার আত্মস্বরূপ(নিজের রূপ) শিবের পূজা করিবে না ইহাই আমার ধারণা।”

ব্যাখ্যা:-এই শ্লোক দ্বয়ে আত্মস্বরূপ কথাটি গুরত্বপূর্ণ। কেননা আত্ম+স্বরূপ যেখানে অর্থ আসে-আত্ম-নিজ এবং স্বরূপ-নিজের রূপ। অর্থ্যাৎ এটাই প্রতিপন্ন হয়-শ্রী কৃষ্ণ তার নিজের রূপের পূজা করেছে কোন উপ ঈশ্বরের আরধানা করেন নাই। সুতারাং নিজের কাছেই তিনি তার সুদর্শন চক্র লাভ করেছেন। এখন আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন-আপনি যে শিবের কথা বলছেন সেই শিব ও শৈবরা যে শিবের ভক্ত সেই শিব কি আলাদা কেউ? তাকে বলবো-যে কৃষ্ণকে মানব নয় সেই কৃষ্ণ হলেন সচ্চিদানন্দ নারায়ণ স্বয়ং। অতত্রব প্রতীয়মান হলো কৃষ্ণ নিজের কাছে নিজেই সুদর্শন চক্র নিয়েছেন ও নিজের স্তব তিনি নিজেই করেছেন।

কৃষ্ণের উদ্দ্যশ্যে নারদ কি বলেছেন-“নারদ বললেন হে বাসুদেব আপনি সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য সবার উপাসনার উপাস্য।”
[মহা.শান্তিপর্ব-৩২৪/৪]

এবার জেনেনিই এই “সুদর্শন চক্র” পূর্বে কার কাছে ছিলো?

“বিষ্ণুশ্চক্রঞ্চ তদঘোরং বজ্রমাখন্ডুলস্য চ
শীণং পুরা ভবত্তাম!গ্রহস্যাঙ্গেষু কেশব।”

[মহা.অনুশাসনপর্ব-১৩/৭৪]
অনুবাদ-যুধিষ্ঠির বললেন হে কৃষ্ণ! বিষ্ণুর সেই ভয়ংকর চক্র ও ইন্দ্রের বজ্র পূর্ব্বকালে সেই মন্দাবের অংগে পতিত হয়ে বিশীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিষ্ণুর নিকটে পূর্ব হতেই এই সুদর্শন চক্র ছিলো। কিন্তু সেই চক্র মন্দাব নামে এক অসুরের অংগে বিশীর্ণ হয়। এখন প্রশ্ন আসে এই মন্দাব কে? এই অধ্যায়ের ৭৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে মন্দাব হলেন দৈত্য হিরণ্যকশিপু যিনি শিবের বরে ইন্দ্রের সাথে দশকোটি বৎসর যুদ্ধ করেন। যখন এই যুদ্ধে বিষ্ণুর চক্র এই মন্দাবের অংগে বিশীর্ণ হয় তারপরে মহাদেব এই যুদ্ধে অন্ধকাসুরকে বধ করে চক্র উৎপাদন করেন এবং সেই চক্রই কৃষ্ণকে প্রদান করেন। অর্থ্যাৎ-পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ তার নিজ স্বরূপ শিবের দ্বারা অসুর কে বধ করে নিজের চক্র নিজের কাছেই ফিরিয়ে আনেন। এই হলো "শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র লাভের" সত্য ঘটনা।
[বি. দ্র--উক্ত রেফারেন্স গুলো "হরিদাসসিদ্ধান্ত বাগীশ" অনুদিত মহাভারতের]

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র-

হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপথে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধা কান্ত নমহস্তুতে।।
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় বাসুদেবায়
নমঃ নমঃ।।
জয় শ্রী কৃষ্ণ!

BANGL

॥মহামায়া ও যোগমায়া॥

জীবনের কেন্দ্রে আছেন আত্মারূপ ঈশ্বর,
মায়ার আবরণে তাঁর ব্যাহত বিস্তার,
যোগমায়া মহামায়া তাঁর দুইরূপ মায়া,
বাহির জগতের টানেন তিনি মহামায়া,
অন্তর জগতে টানেন তিনি যোগমায়া,
গুরু দুই রূপেতেই টানেন হয়ে ছায়া।

আত্মচেতনাতে হয় চৈতন্যময়ীর বিকাশ,
মহাশক্তির আরাধনায় বোধনে তাঁর হয় প্রকাশ,
আত্মবিদ্যা যোগমায়া আত্মবোধে করে উন্নীত,
অরূপচৈতন্য হয়ে অচেতনকে করেন সদা প্রতিহত।
মহামায়ার সংসারে সকল মায়াময়ের বিকাশ,
যত পাবে জীব জীবনের পার্থিব বস্তুর করে আশ।

BANGL

মহামায়ার রচিত পার্থিব বস্তু প্রকৃতি,
তাঁর খেলা তিনি খেলেই দুরূহ তাঁর গতি।
ভোলান প্রতিনিয়ত মন বুদ্ধি অহংকার,
প্রলোভনের প্রেয় দিয়ে জীবন ছারখার।
আকাঙ্খা বাসনার বশে রাখেন সকল
সেই হতে চক্রে ঘুরে চলে মন বিকল।

যোগমায়া থাকেন বসে হৃদয় গভীরে,
জাগান ঈশ্বর অনুভূতি জীবের অন্তরে।
নিয়ে যান ইন্দ্রিয় অনুভূতি ইন্দ্রিয়াতীতে,
যোগ ধ্যান চৈতন্য মন্ত্রে টানেন অন্তর্হিতে।
আত্মবোধের আকাঙ্খা জাগান আপন চেনাতে
ঘুরিয়ে মারেন জীবকে ধ্যানগম্য চেতনাতে।

মহামায়া যোগমায়া দুই-ই গুরুর করে
একহাতে টানেন কাছে, আরেক হাতে ঠেলে দূরে।
জীবনধারণের জন্য হন মহামায়া,
আত্মা চেনাতে সাজেন যোগমায়া।
প্রেয়কে সরিয়ে ধীরে শ্রেয়রূপে টেনে,

নিয়ে চলেন সদগুরু অনন্ত আনন্দ পানে।

॥মহামায়া ও যোগমায়া॥

রবীন্দ্রনাথের একটা গান আমার খুব প্রিয়, গানটা হল:

ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধভরে তন্দ্রাহারা॥
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা॥

ওগো নদী, চলার বেগে পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে আপন-হারা-
আমার চলা যায় না বলা-
আলোর পানে প্রাণের চলা-
আকাশ বোঝে আনন্দ তার,
বোঝে নিশার নীরব তারা॥

BANGLADARSHAN.COM

ক্রান্তদর্শী দার্শনিক ও ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনা কত গভীরে ছিল এই গান তার নিদর্শন। আচ্ছা, মহামায়া আর যোগমায়ার আলোচনায় এই গানের কী প্রয়োজন? আছে, আছে, বলছি তাহলে.... সৃষ্টির ক্রমে দুরকম বিস্তার হয়, একটা উল্লম্ব বা ভার্টিকাল আর একটা অনুভূমিক বা হরাইজোনটাল। এটা আরো ভালো বোঝাতে শিবলিঙ্গের উদাহরণ নেওয়া যাক, শিবলিঙ্গের মাঝে যোনিপীঠ হল হরাইজোন্টাল বা অনুভূমিক বিস্তার আর ঊর্ধপানে যেটা দৃশ্যমান সেটা উল্লম্ব বা ভার্টিকাল বিস্তার। তেমনই নদীর চলা বা বিস্তার হচ্ছে নিজেকে অনুভূমিক ভাবে ব্যাপ্ত করা আর চাঁপার তরু বা বৃক্ষের চলা হচ্ছে উর্ধপানে আলোর দিকে প্রাণের চলা যা আদতে আনন্দের উৎসে চলা।

এই দুই গতিই হচ্ছে মহামায়া আর যোগমায়া। মানুষের যে বেড়ে উঠে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া, তার আশা, আকাঙ্খা, বাসনা ও তার চরিতার্থতা সেটা হয় মহামায়ার প্রভাবে বা ইচ্ছায়, যেহেতু বাহির মুখে নিজেকে ছড়াতে চাওয়া তাই সেই বিস্তারে কিছু কিছু বাধা বিপত্তি বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সেখানে একজনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটু ধাক্কা বা স্পর্শে অসহিষ্ণুতা থেকে গন্ডগোল তৈরী হয়ে থাকে, কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে রাজী নয়। সেই কারণে জাগতিক সম্পদ লাভের জন্য যে পুজো তা মহামায়ার পুজো, দুর্গাপুজো, কালীর পুজো। আর আত্মবোধের যে যাত্রা, যে চলন সেটা অন্তরঙ্গের পুজো বা সাধনা। সেটা নিজের আত্মাকে আশ্রয় করে নিজের উৎসের সন্ধানে যাওয়া, সেটা যোগমায়ার সাধনা।সেখানে আসে গুরুকৃপা, সদ্গুরুলাভ, সত্ত্বগুণের সাধনা,মন্ত্র, ক্রিয়া, সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা যা আস্তে আস্তে নিয়ে যাবে সেই আনন্দস্বরূপ অমৃতজ্যোতির দিকে।

মহামায়া আর যোগমায়া উভয়ের কৃপাই লাভ হয় সদগুরুর সান্নিধ্যে ও সদ্গুরু কৃপায় কারণ বেঁচে থাকার, দেহ ধারণের যে রসদ নিতে হবে জাগতিক পৃথিবী থেকে সেই বৃত্তি, ক্ষুধা, সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থ, কাম এসব একহাতে মহামায়া দিয়ে তার ফলস্বরূপ বিক্ষেপও তৈরী করে দেন, তাই সদ্গুরু একহাত দিয়ে মহামায়ার মত দূরে রাখেন আর আরেকহাতে দীক্ষা দিয়ে দিগদর্শন করিয়ে নিজের দিকে টানেন যোগমায়ার মায়া হয়ে। সেই ঘুরে ফিরে ভার্টিকাল ফোর্স যোগমায়া হয়ে আর হরাইজোন্টাল ফোর্স মহামায়া হয়ে যা পার্থিব জগতে নিত্য ক্রিয়াশীল।

শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা সনাতনী মানুষের নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। এই তিন মহাগ্রন্থেই ভগবানের মায়াশক্তির বিচিত্র পরিচয় রয়েছে। এছাড়াও পঞ্চদশী, নারদপঞ্চরাত্র, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই মায়ার শক্তিকে কখনো বিদ্যা, কখনো অবিদ্যা, কখনো যোগনিদ্রা, কখনো বৈষ্ণবীমায়া আবার কখনো ভগবানের দিব্যলীলা প্রকাশিকা শক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত তিনটি বিভাগ–মায়া, মহামায়া ও যোগমায়া প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে এসব প্রামাণ্য গ্রন্থে।

আভিধানিক অর্থে মায়া হলো মমতা, মোহ, শঠতা, চাতুরী, ইন্দ্রজাল, কুহক প্রভৃতি এবং অবিদ্যা, মিথ্যাবুদ্ধিত্ব হেতু অজ্ঞানতা। ইংরেজিতে মায়াকে প্রতিশব্দে বুঝানো হয়েছে Illusion, Delusion, Deception বা মায়া, মোহ, বিভ্রান্তি। অভিধানের বাইরে সনাতনী ধর্মগ্রন্থাদি পর্যালোচনায় মায়াকে একরূপ শক্তি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে– সনাতনী 'মায়া' শক্তিই বিদ্যারূপে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি দেন, আবার অবিদ্যারূপে সংসারবন্ধনে বদ্ধ করেন। মায়া, আবরিকাশক্তি কিন্তু অখিলেশ্বরী। দেহ–অভিমানী তাবৎ জীবগণকে জগতে তিনি মুগ্ধ করে রাখেন। এই যে অপরিমেয় শক্তির ধারক এই মায়া, তাও সনাতন ধর্মে ভগবৎ শক্তিরই তেজ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও তারই শক্তি 'মায়া'-কে এভাবে দুরতিক্রম্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অর্থাৎ, আমার ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্য। যেসব ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হয়ে ভজনা করে তারাই কেবল আমার এই দুস্তর মায়া থেকে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'মায়া' শক্তির দুটো বৈশিষ্ট্য যোগ করে ভক্তকে সংশয় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। 'দৈবী' বা অলৌকিক, আর 'গুণময়ী' বা ত্রিগুণময়ী (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ)।

এই মায়াকে 'মহামায়া' বা 'যোগমায়া'র সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার প্রবণতা থেকেও আমাদের তিনি মুক্ত করেছেন। 'অবিদ্যাময়' জগতে মায়া, 'বিদ্যাময়' জগতে মহামায়া আর 'ভগবানের লীলাময় চিত্ শক্তির প্রকাশে' যোগমায়া। 'অবিদ্যা'রূপে মায়া সবাইকে বেঁধে রেখেছেন, আবার 'বিদ্যা'রূপে কাউকে মুক্তি দিচ্ছেন। উপনিষদেও 'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যা' বা 'অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীব প্রবুদ্ধতে' ইত্যাদি বাক্যে মায়ার বন্ধনশক্তিকেই জগৎসৃষ্টি বা জীবমোহন কালে মায়ার প্রভাব বলে বর্ণিত রয়েছে।

তবে মহামায়ার পরিচয় কী? একই প্রশ্ন শ্রীশ্রীচণ্ডতে সুরথ রাজার মুখে, অর্থাৎ সেই জগন্মূর্তি মহামায়া নিত্যা, এই জগৎ ওই দেবী মহামায়ারই মূর্তিস্বরূপ, জন্মমৃত্যুরহিত। দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি আবির্ভূত হন। এইটি নূতন সংবাদ। 'মায়া' স্বাভাবিকী, কিন্তু মহামায়া 'আবশ্যিকী'। 'বিমুখমোহিনী' মায়া আপামর সব জীবকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু 'উন্মুখমোহিনী' মহামায়া দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য 'আবশ্যিকভাবে প্রকাশিতা শক্তি। এই 'বিমুখ' আর 'উন্মুখ' শব্দ দুটি গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ।

এই মহামায়াই বিদ্যারূপে জীবকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু গুণময়ী মায়া অবিদ্যারূপে জীবকে সংসারে বেঁধেও রাখেন।

আরও একটু গভীরে অনুসন্ধান করলে মায়া আর মহামায়াতে গুণভেদ লক্ষ্য করা যায়–রজঃ আর তমঃ গুণের আধিক্যে 'মায়া' আর 'সত্ত্বগুণের আধিক্যে 'মহামায়া' শক্তির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।' আর ত্রিগুনাতীতা যোগমায়া। জীব ভগবানের অংশ হওয়া সত্ত্বেও ভগবৎ বিমুখীনতার জন্য মায়ার আবরণে 'আত্মা'কে জানতে পারে না। 'যয়া সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং'–ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিশাস্ত্র বিজ্ঞাপিত করছে মায়ার সম্মোহনী শক্তির কথা। বেদান্তশাস্ত্রেও ঈশ্বরোপাধি বা জীবোপাধিভেদে মায়ার দু'রকম প্রভেদ দেখা যায়।

অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা এবং মলিন সত্ত্বপ্রধানাভেদে মায়া ও অবিদ্যা এই দুই নামে মায়ার প্রসিদ্ধি দেখা যায়। তারমধ্যে মায়া–প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, মায়াকে স্ববশে রেখে জগৎ সৃষ্টি কাজ করে থাকেন আর জীবগণ অবিদ্যার বশবর্তী হয়ে বিবিধ সংসারদুঃখ ভোগ করে।

এবার যোগমায়ার কথা। এ মায়া ভগবানের নিজ লীলা প্রকাশে সহায়িকাশক্তি।

ভাগবদ–বক্তা শ্রীশুকদেব বলছেন, 'শ্রীভগবান মল্লিকাদি বিবিধ শারদীয় ফুল প্রকাশে পরিশোভিত উৎফুল্ল রাত্রি দেখে নিজ যোগমায়াশক্তি প্রকটিত করে রমণ করতে মানস করলেন।' শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনার প্রথম সূত্রপাত।

প্রথমে জীব, তারপর সত্ত্বগুণাশ্রয়ী দেবগণ, শেষে স্বয়ং ভগবানের কথা। একই পরম্পরায় মায়া, মহামায়া ও যোগমায়ার আরোহী তত্ত্ব। সনাতন ধর্মতত্ত্ব যেন নিজ ভাণ্ডারের সব গোপন রহস্য বিশ্বনিচয়ে জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী মানুষের জন্য খুলে ধরেছে। রিচার্ড ডকিন্স যখন ঈশ্বরকে বলছেন Delusion বা মায়া, যখন তিনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে ভগবানের উদ্দেশ্য না পেয়ে বেগতিক দেখে ভগবদ্ভক্তের মায়া থেকে উত্তরণকে বলছেন– The Worship of gaps তখন সনাতন শাস্ত্র তাকে ডেকে বলছেন, ওটা gaps নয়। ওটা অজ্ঞানীর অন্ধকার। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত চিত্তভূমিতে মায়ার আবরণে যাকে gaps বলে মনে হয়–তাকেই একাগ্র বা নিরুদ্ধ চিত্তভূমিতে ভগবানের চিৎশক্তির লীলা বলে ধরা পড়ে। এই যোগমায়া শক্তির আভাস পেলে ওই gaps বা শূন্যতা আর থাকে না। তখন হয় পরিপূর্ণ ব্রহ্মপদ! যোগমায়ায় শক্তি সমস্ত জ্ঞানের পরিপূর্ণতা। সেখানে মায়া বা অবিদ্যা, বিদ্যা বা মহামায়ার আপেক্ষিকতা নেই। যেখানে আপেক্ষিকতা দ্বৈততা, সেখানেই gaps। কোন বৈষয়িক উন্নতিতে gaps পূরণ সম্ভব হবার নয়। তিনি বলেছেন, প্রায় একই নিঃশ্বাসে, gaps shrink as science advances, and God is threatened with eventually getting nothing to do and no where to hide. বিজ্ঞানী ভাবছেন, আবিষ্কারের ফলে ওই gaps বা অজ্ঞতা কমে যায়, পরিণামে 'ভগবানের' প্রয়োজন মিটে যায়, তার পালাবারও স্থান থাকে না। কী ভয়ংকর তর্কজাল। যা নতুন নতুন আবিষ্কার তার সবই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই অঙ্গীভূত। বিজ্ঞান যত এগোবে তত মায়া বা gaps দূর হয়ে ভগবানই স্পষ্ট হয়ে উঠবেন। রাত যত এগোবে, দিন ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর, রাতেও তো সূর্যের মৃত্যু হয় না। সূর্যকে তাই উপেক্ষা করা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানসুলভ মনোভাব নয়।

ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি এই যোগমায়া। তিনিই দুর্গতিহারিণী, একা, অনংশা প্রভৃতি নামে নানা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধা। সর্বশক্তিবরীয়সী, শ্রীভগবানের লীলাতত্ত্বজ্ঞা এবং মহাবিষ্ণুস্বরূপা। তার তত্ত্ব জানতে পারলে পরাৎপর দেবদেব শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মপ্রাপ্তি সুলভ হয়। তিনি প্রেমসর্বস্বভাবা ও গোকুলাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধিকাশক্তি । প্রপঞ্চের অধিকারিনী মহামায়া তারই আবরণী শক্তি।

শ্রীমদ ভাগবতে বলা হয়েছে-"যাগেমায়াম উপাসৃত"
অর্থাৎ যোগমায়াকে আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে নিত্য লীলা বিলাস করেছিলেন। মহামায়ার কবলিত হয়ে নয়।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির প্রধান দুটি শক্তি হলেন মহামায়া ও যোগমায়া। এই যোগমায়া অন্তরঙ্গের শক্তি। তার উপাসনায় কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। আর মহামায়া হলেন বহিরঙ্গের শক্তি যা সমস্ত বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। মহামায়া উপাসনায় জড়জাগতিক বৈভবপ্রাপ্তি হয়ে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলেছেন যে তিনি তার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তাই তিনি তার লীলাপ্রকটের জন্য যোগমায়া শক্তি বা বিষ্ণুশক্তিকে সঙ্গে করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ভগবানের এই যোগমায়া শক্তি বা বিষ্ণুশক্তি হলেন ভগবানের লীলাশক্তি যিনি ভগবানের ভগবত্ব ঢাকেন, ভক্তদের ভুলিয়ে রাখেন এবং ভগবানকে ভগবান বলে জানতে দেন না অথচ ভক্তদের ভগবানের প্রতি এগিয়ে দেন আর ভক্ত ও ভগবান উভয়কে ভুলিয়ে ভগবানের মানবলীলায় মাধুর্যদান করেন। ফলে উভয়ের প্রেম-প্রীতিলীলা সম্ভব হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলা সবই যোগমায়ার আশ্রয়ে।তবে যোগমায়া ভগবানকে লীলা মাধুর্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ঢাকেন।তাই যোগমায়া যেখানে কাজ করেন সেখানে মহামায়া পথ ছেড়ে দেন।

আদিতে 'মধু-কৈটভের' হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 'ব্রহ্মা' স্তব করলে সেই সময় ভগবান বিষ্ণুর 'নেত্র' থেকে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে। এই কারনে তাকে 'বিষ্ণুমায়া' বলা হয়। বিষ্ণু পুরাণে তাকে 'পরম বৈষ্ণবী' বলা হয়েছে। যোগমায়া সাধারণত নিরাকার কিন্তু কখনো কখনো তিনি 'অষ্টভুজা দেবী' রূপে স্বাকার হন, এই অষ্টভুজা রূপেই তিনি 'কংসের কারাগারে' প্রকট হয়েছিলেন।এই অষ্টভুজা দেবীকে আরাধনা করেছিলেন কাত্যায়নীরূপে গোপিনীরা কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য।

মহামায়া আর যোগমায়ার স্বরূপ এই নীচের কবিতায় ধরার চেষ্টা করেছি। আর যেটুকু লিখলাম সেটুকু সবটাই গুরুকৃপায় যিনি প্রতিনিয়ত অন্তরে বসে ভাবতে বাধ্য করাচ্ছেন আমাকে সৃষ্টিতত্ত্বকে।

মহামায়া ও যোগমায়া
****

জীবনের কেন্দ্রে আছেন আত্মারূপ ঈশ্বর,
মায়ার আবরণে তাঁর ব্যাহত বিস্তার,
যোগমায়া মহামায়া তাঁর দুইরূপ মায়া,
বাহির জগতের টানেন তিনি মহামায়া,
অন্তর জগতে টানেন তিনি যোগমায়া,

গুরু দুই রূপেতেই টানেন হয়ে ছায়া।

আত্মচেতনাতে হয় চৈতন্যময়ীর বিকাশ,
মহাশক্তির আরাধনায় বোধনে তাঁর হয় প্রকাশ,
আত্মবিদ্যা যোগমায়া আত্মবোধে করে উন্নীত,
অরূপচৈতন্য হয়ে অচেতনকে করেন সদা প্রতিহত।
মহামায়ার সংসারে সকল মায়াময়ের বিকাশ,
যত পাবে জীব জীবনের পার্থিব বস্তুর করে আশ।

মহামায়ার রচিত পার্থিব বস্তু প্রকৃতি,
তাঁর খেলা তিনি খেলেই দুরূহ তাঁর গতি।
ভোলান প্রতিনিয়ত মন বুদ্ধি অহংকার,
প্রলোভনের প্রেয় দিয়ে জীবন ছারখার।
আকাঙ্খা বাসনার বশে রাখেন সকল
সেই হতে চক্রে ঘুরে চলে মন বিকল।

BANGL

যোগমায়া থাকেন বসে হৃদয় গভীরে,
জাগান ঈশ্বর অনুভূতি জীবের অন্তরে।
নিয়ে যান ইন্দ্রিয় অনুভূতি ইন্দ্রিয়াতীতে,
যোগ ধ্যান চৈতন্য মন্ত্রে টানেন অন্তর্হিতে।
আত্মবোধের আকাঙ্খা জাগান আপন চেনাতে
ঘুরিয়ে মারেন জীবকে ধ্যানগম্য চেতনাতে।

মহামায়া যোগমায়া দুই-ই গুরুর করে
একহাতে টানেন কাছে, আরেক হাতে ঠেলে দূরে।
জীবনধারণের জন্য হন মহামায়া,
আত্মা চেনাতে সাজেন যোগমায়া।
প্রেয়কে সরিয়ে ধীরে শ্রেয়রূপে টেনে,
নিয়ে চলেন সদগুরু অনন্ত আনন্দ পানে।

তথ্যসূত্র : দেবী ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবতম,
জয়দীপ মহারাজের প্রবচন

॥রাধারাণীর আবির্ভাব রাধাষ্টমী॥

আজকে রাধাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে রাধারাণীকে স্মরণ করে এই লেখা:

রাধাস্তব

****

জয় জয় বৃষভানুনন্দিনী
জয় জয় রাসেশ্বরী
জয়তী জয় রাসবিলাসীনী
জয় জয়তী কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী
নীলাম্বরী পরণে দেবী
অষ্টসখী পরিবৃতা,
ষোড়শী কিশোরী ধনি
রাধারানী আহ্লাদিতা।
কৃষ্ণ আরাধিকা দেবী
পরমাপ্রকৃতি স্বরূপা,
গোপিনীশ্রেষ্ঠা রাধিকা
কৃষ্ণ প্রাণস্বরূপা।
যোগীনী যোগেশ্বরী
কৃষ্ণপ্রেমে অটল প্রাণ,
দাও কৃষ্ণভক্তি দেবী
কৃষ্ণময় হোক তনু মন।

BANGL

ঋষি শৌনক মহামতি সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সূত, অন্যান্য দেবতাদের উপাসনার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই শ্রেষ্ঠ বলে জানি। আরও শুনেছি, তার চেয়েও রাধারানির আরাধনা অধিকতর পুণ্যপ্রদ ও শেষ্ঠ। অতএব শ্রীরাধার অর্চনা বিষয়ে কোনও ব্রতাদির কথা বলুন। সূত বললেন, হে ঋষিবর! আমি একটি গোপনীয় ব্রতের কথা বলছি শুনুন।

একদিন দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,ভগবান! আপনার শ্রীমুখে অনেক ব্রতের কথা শুনেছি। এখন শ্রীমতি রাধিকার জন্মদিনের ব্রতকথা শুনতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেবর্ষি! তুমি আমার পরম ভক্ত।

সে জন্য তোমার কাছে বলছি, শ্রবণ কর। কোনও এক সময় সূর্যদেব ত্রিলোক ভ্রমণ করতে করতে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য দেখে মনে মনে তপস্যার সঙ্কল্প করে, মন্দার পর্বতের গুহায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। এই ভাবে দীর্ঘ দিন গত হলো। সূর্যের কঠোর তপস্যা আর পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় দেবতারা ভীত হলেন। ইন্দ্র

দেবগণ-সহ আমার কাছে এসে সব কথা বলে। আমি বললাম, হে দেবগণ। সূর্য থেকে তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমরা নিজ নিজ স্থানে যাও। আমি সুর্যদেবকে তপস্যা থেকে নিরস্ত করব। তারপর আমি সূর্যের কাছে গেলাম। সূর্য আমাকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, হে শ্রীহরি! আপনার দর্শন পেয়ে আমার জন্ম ও তপস্যা সার্থক হলো।

যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কর্তা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যাঁকে সবসময় চিন্তা করেন, তাকে দর্শন করে আমি ধন্য হলাম। আমি সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যকে বললাম, হে দিবাকর! তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ। এখন বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার পরম ভক্ত, সে জন্যই তোমাকে আমি দর্শন দিলাম। এই কথা শুনে সূর্য বললেন, হে প্রভু! আমাকে একটি গুণবতী কন্যার বর দিন। আপনি চির দিন সেই কন্যাটির বশীভূত থাকবেন। এ ছাড়া আমার আর কোনও ইচ্ছা নেই। আমি তথাস্তু বলে তাকে বললাম, এই ত্রিলোকে আমি একমাত্র শ্রীরাধিকারই বশীভূত। শ্রীরাধা এবং আমাতে কোনও প্রভেদ নাই। আমি পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য বৃন্দাবনে নন্দালয়ে অবতীর্ণ হব। তুমিও সেখানে বৃষভানু নামে রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। শ্রীরাধা তোমার কন্যারূপে অবতীর্ণ হবেন। রাধা নামের সঙ্গে কৃষ্ণ নাম যুক্ত করে জপ করলে যাবতীয় মন্ত্র জপের ফল লাভ হয়। তপ-জপে আমার যেমন সন্তোষ জন্মে, এক বার রাধানাম উচ্চারণ করলে তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি আমি সন্তোষ লাভ করি। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে সব দুঃখ দূর হয় ও পরম শান্তি লাভ হয়। ধনৈশ্বর্যে গৃহ পূর্ণ হয় এবং সর্বস্থানে বিজয় লাভ হয়। ভক্তের কাছে এই ব্রতের কথা বললে সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়। কিন্তু ভণ্ড, পাষণ্ড, ভক্তিহীন নাস্তিকের কাছে প্রকাশ করলে অমঙ্গল হয়। শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই কথা শুনে নারদ মর্তে এই ব্রত প্রচার করলেন আর নিজেও ব্রতপালন করলেন।

দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনের রাজা বৃষভানু ছিলেন একজন পরমভক্ত। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। একসময়ে তাঁর স্ত্রী কীর্তিদা গর্ভবতী হলেন। একদিন রাজা বৃষভানু দেখতে পেলেন যমুনার জলে একটি পদ্মফুল তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি পদ্মফুলের ভিতর একটি কন্যা সন্তান দেখতে পেয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। বৃষভানু ও তাঁর স্ত্রী কীর্তিদা সন্তানটি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। সেদিন ছিল ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথি। মধ্যাহ্নকালে শুভক্ষণে কন্যা সন্তানটি অষ্টভূজা রূপে আবির্ভূত হলেন। বাৎসল্য রসের পুষ্টিবিধানের জন্য পরে দ্বিভূজ রূপ ধারণ করেন। বৃষভানু ও কীর্তিদা বুঝতে পারলেন সন্তানটি বিষ্ণুমায়া রাধারানী।

ব্রজের সকলেই মেয়ের রূপে মুগ্ধ হলেও তাঁর চোখ মুদ্রিত ছিল বলে সকলেই মনে করল মেয়েটি অন্ধ। তাঁর চোখ মুদ্রিত ছিল যেহেতু তিনি ভৌম বৃন্দাবনে আবির্ভূত হলে শ্রীকৃষ্ণকে না দেখা পর্যন্ত চোখ খুলবেন না বলে কৃষ্ণকে আগেই জানিয়েছিলেন।

রাজা বৃষভানু সেদিন রাধারানীর জন্মোৎসব আয়োজন করলে নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে নিয়ে আসেন। তখন শ্রীহরি মথুরায় শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন নন্দালয়ে। সকলের অগোচরে কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে রাধারানীর কাছে যাওয়া মাত্রই রাধারানী চোখ খুলে কৃষ্ণকে দেখতে পান। রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা এভাবেই শুরু। শ্রীরাধার জন্মতিথিতে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বসন-ভূষণ দ্বারা শ্রীরাধার পূজা করে, নানা প্রকার মহোৎসব, ক্রীড়া, কৌতুকাদি করতে হয়। রাধার সখীবৃন্দ, গোপিকাবৃন্দ, কীর্তিদা, বৃষভানু, প্রভৃতিরও পূজা করতে হয়।

“বৃন্দাবন বিলাসীনী রাই আমাদের,
রাই আমাদের, রাই আমাদের, শ্যাম তোমাদের।”

বাঙ্গালী মননে কেমন রাধাকৃষ্ণের মূর্তি তার বর্ণনায়:

যুগল শশী যেন বৃন্দাবনে
দোলে কৃষ্ণমেঘে ঐ সৌদামিনী
হিল্লোল দেয় দোল ব্রজগোপিনী....
দোলে কুঞ্জবনে দুহুঁ রঙ্গে বিভোর
মন জানে কেবা শ্যাম কেবা চকোর...

শ্রীমতি রাধারানী হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তির মূর্ত প্রকাশ, যিনি নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত। হ্লাদিনী শক্তির সার 'ভগবৎ প্রেম', ভগবৎ প্রেমের সার 'ভাব' এবং ভাবের পরম প্রকাশ হচ্ছে 'মহাভাব।' শ্রীমতি রাধারানী হচ্ছেন মহাভাবের মূর্ত প্রকাশ এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের একমাত্র উৎস।

শ্রীমতি রাধারানীর চিজ্জগতে প্রকাশ সম্বন্ধে নারদ পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে-

দ্বিভূজ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমন্ডলে।
গোপবেশশ্চ তরুণ জলদশ্যামসুন্দরঃ।। ২/৩/২১
এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ।। ২/৩/২৪

BANGLADARSHAN.COM

নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর ও গোপবেশধারী সেই দ্বিভুজ তরুণ বিভক্ত হলেন। তাঁর এক ভাগ স্ত্রী হলো, তাঁকে বিষ্ণুমায়া বলে (তিনিই রাধা) এবং অপরভাগে তিনি স্বয়ং বিভু পুরুষরূপে রইলেন। কেবল লীলা রস আস্বাদন করার জন্য দুই দেহ ধারন করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে আনন্দ প্রদান করার জন্য তাঁর বাম অংশ থেকে শ্রীরাধাকে সৃষ্টি করেছেন।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।। চৈ চ আদি ৪/৯৮

রাধাদ্যাঃ পূর্ণ্যা শক্তয়ঃ-শ্রুতি প্রমাণে আদ্যাশক্তি, রাধা এবং রাধাই পূর্ণ শক্তি। আর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। রাধা-কৃষ্ণই, কৃষ্ণই রাধা। তাঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কস্তুরী থেকে যেমন তার গন্ধ আলাদা করা যায় না, আগুন থেকে যেমন তার তাপকে আলাদা করা যায় না, তেমনি রাধাকৃষ্ণও কেবল লীলার নিমিত্তে দুইরূপে বিলাস করছেন–স্বরূপত তাঁরা এক।

শ্রীকৃষ্ণের লীলার পুষ্টিবিধানের জন্য রাধারানী থেকে বৃন্দাবনের গোপীগন, দ্বারকার মহিষীগন এবং বৈকুন্ঠের লক্ষীগন প্রকাশিত হয়েছেন। পদ্মপুরান, পাতালখন্ড (৫০/৫৩-৫৫) অনুসারে, শ্রীশিব নারদকে বলছেন-

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥
ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥

সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণো প্রভুঃ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোহপি মুনিসত্তম॥

দেবী শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীস্বরূপা, তিনি কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী, এজন্য মনীষীগন তাঁকে হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী বলেন। ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগন তাঁরই কলার কোটি কোটি অংশের একাংশ, শ্রীরাধার অষ্টসখীর মধ্যে ললিতা যিনি তিনিই দুর্গা। শ্রীরাধাই মহালক্ষ্মী আর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ।

হে মুনিসত্তম এঁদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। অর্থাৎ, শ্রীমতি রাধারানী যে শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য হ্লাদিনী শক্তি এ ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। তাঁরা পরস্পর নিত্যসঙ্গী। গোলক বৃন্দাবন ধামে তাঁরা নিত্য লীলা বিলাস করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারানীর সমস্ত লীলা হচ্ছে প্রেমময়। এ জগতে প্রেমের লেশমাত্র গন্ধ নেই। এটি কামময় জগত। কাম ও প্রেমের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা হলো কাম, আর পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধনের ইচ্ছাকে বলে প্রেম।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বান্ছা হলো কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিকার। শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলোকে পৃথক পৃথক দেহ ধারন করে আছেন। এভাবে তাঁরা পরস্পরের প্রেমরস আস্বাদন করেন।

সেই চিন্ময় দেহধারী রাধাকৃষ্ণ গোলক থেকে দ্বাপর যুগে আবির্ভূত হয়ে বৃন্দাবনে বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে লীলা রস আস্বাদন করেন। গোপালতাপনী শ্রুতি হতে জানা যায় যে, শ্রীরাধা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা, সর্বোত্তমা প্রেয়সী।

তস্য আদ্যা প্রকৃতি রাধিকা নিত্যা নির্গুণা।
যস্য অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তয়॥

“তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) আদ্যাশক্তি রাধিকা হচ্ছেন নিত্যা, নির্গুণা, লক্ষ্মী, দুর্গা ইত্যাদিসহ ভগবানের শক্তিরাজি তাঁর (রাধিকার) অংশ স্বরূপ।”

এভাবে গোপালতাপনী শ্রুতিতে রাধাকে আদ্যাশক্তি, ভগবানের মূল শক্তিরূপে বর্ননা করা হয়েছে।

ঋক-পরিশিষ্টে উল্লেখ আছে-
রাধয়া মাধবো দেবো মাধবো নৈব রাধিকা বিভ্রাজন্মে জনেস্বেতি।

“রাধা মাধবের দ্বারা বিভাসিত এবং মাধব রাধা দ্বারা বিভাসিত হয়েছেন। এভাবে পরস্পর দ্যুতিমান হয়ে তাঁরা লোকমধ্যে বিরাজ করছেন।”

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে-
সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বং চ তত্ত্বত্রয়ং অহং কিল।
ত্রিতত্ত্বরূপিনী সাপি রাধিকা নম বল্লভা॥

“আমি যদিও নিত্যানন্দময়, তবুও আমি ত্রিতত্ত্বস্বরূপ, এই সৃষ্টির কার্য ও কারণ উভয়ই এবং উভয়ের অতীত। তেমনই, যদিও রাধা নিত্যানন্দময়, দিব্যানন্দের মূর্ত বিগ্রহ, তবুও তিনি ত্রিতত্ত্বস্বরূপা, সৃষ্টির কার্য ও কারণ এবং উভয়ের অতীত।”
এর অর্থ হচ্ছে, ঠিক যেমন কৃষ্ণ সর্ব কারণের কারণ এবং সব কিছুর অতীত, তেমনি রাধা পরা শক্তি হওয়া সত্ত্বেও সর্ব কারণের কারণ ও সব কিছুর অতীত এবং তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অবিকৃত, একই-তিনি সর্ব কারণের কারণ।

নারদ পন্চরাত্রে উল্লেখ আছে-

লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা
দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্বর্গ প্রসবিনী।
রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা॥

গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে-

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

শেষ ‘পরা’ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, রাধা হচ্ছেন ভগবানের সকল শক্তিরাজির মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

পদ্মপুরানে বলা হয়েছে-

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুন্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

ঠিক যেমন রাধা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, ঠিক তেমনই তাঁর স্নান স্থানও (রাধাকুন্ড) তাঁর প্রিয়। একাকী শ্রীরাধা সকল গোপিকাগনের মধ্যে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

পদ্মপুরানে স্বয়ং শিবের উক্তি --

“কৃষ্ণ জগতাং তাতঃ
জগন্মাতা চ রাধিকা।”

পরম বৈষ্ণব শিব দেবর্ষি নারদকে বলেছেন-
প্রথমেই ‘রাধা’ শব্দ এবং পরে ‘কৃষ্ণ’শব্দ উচ্চারণ করতে। এর বিপরীত হলে ব্রহ্ম হত্যার পাপ হবে।” (শ্রী নারদ পন্চরাত্র ৫/৬/৬)

মৎসপুরাণ (রুক্মিনী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে), বায়ুপুরাণ(রাধা-বিলাস- রসিকং), বিষ্ণুপুরাণে ১/৮/১৫ শ্লোক এবং বরাহপুরাণেও (তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য) রাধাকে দেখতে পাই। এমনকি ঋকবেদেও (১/২২/৭-৮, ৮/৪৫/২৪) রাধা, রাধস, গোপী শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

দৃশ্যত ভাগবতে রাধানামের দুটি অক্ষর না থাকলেও দক্ষতার সহিত কৌশলে রাধার নাম প্রকাশিত আছে। রাসলীলার বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই কোন সৌভাগ্যশালিনী ভাগ্যবতী বিশেষ গোপী, প্রিয়তমা প্রধানা গোপীকে

সাথে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের অন্তরালে নিভৃতে বিবিধলীলা বিলাস করেছিলেন। এতে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ যাকে নিয়ে গোপনে বিহার করেছেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ বক্ষ বিলাসিনী রাস রাসেশ্বরী শ্রীমতি রাধারানী।
এভাবে রাধারানীর নাম সকল বৈদিক শাস্ত্রে-শ্রুতি স্মৃতি পুরানাদি ও তন্ত্রসমূহে দেখা যায়।
এতগুলো পুরানে রাধারানীর বর্ননা থাকা সত্ত্বেও তিনি সাধারন মানুষের মধ্যে খুব বেশি জ্ঞাত নন তার কারন হলো, রাধারানীর স্বরূপ ও তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়, গোপনীয়। তিনি এজন্য বেদগোপ্য, বেদে সংগুপ্ত বলে অভিহিত হন। যেহেতু তিনি অত্যন্ত গোপনীয় এবং ভগবানের প্রিয়তমা, সেজন্য ভগবান অভিলাষ করেছিলেন যে, তিনি স্বয়ং তাঁর গুণ-মহিমা প্রকাশ করবেন।

যেহেতু সাধারন মানুষের রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেই, সেজন্য ভগবান যোগমায়াকে আদেশ করেন যাতে শাস্ত্রে যেসব অংশে রাধারানীর কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই অংশগুলো যাতে দুর্বোধ্য ও দুর্জ্ঞেয় হয় এবং যাতে তাঁর মহিমা মানুষের কাছে অজ্ঞাত থাকে, যথদিন না তিনি স্বয়ং গোরাঙ্গ-স্বরূপে অবতীর্ণ হয়ে সেই তত্ত্ব প্রকাশ না করেন।

শ্রীমতি রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ, এই দুই তত্ত্বের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে গভীর পারমার্থিক উপলব্ধির প্রয়োজন, শুধু জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। ছোট শিশুকে যতই জ্ঞান দেয়া হোক, তাকে কখনো বুঝানো সম্ভব নয় যে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়। এটা তখনই সে বুঝতে পারবে যখন সে একটা নির্দিষ্ট বয়স ও পরিপক্কতার স্তরে উপনীত হবে। রাধাকৃষ্ণের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে যদি কারো সংশয় থাকে সেটা তার আধ্যাত্মিক অপরিপক্কতা।

এক পূর্ণতত্ত্ব ভগবান দুইরূপে আনন্দ উপভোগ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শক্তিমানতত্ত্ব, আর শ্রীমতি রাধারানী হচ্ছেন অন্তরঙ্গা শক্তিতত্ত্ব। বেদান্ত দর্শন অনুসারে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোন ভেদ নেই, তাঁরা অভিন্ন। শ্রীমতি রাধারানী আমাদেরকে জড় সম্পর্কের বাধা উপেক্ষা করে কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে আমরা দেহাবসানে নিত্যধাম প্রাপ্ত হতে পারি।

একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা বসে গল্প করছিলেন। কথায় কথায় রাধা, শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন-“রাগ অর্থাৎ ক্রোধ কাকে বলে?”

প্রশ্ন শুনে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর উত্তর দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বললেন-“ক্রোধ হল অন্য কারোর ভুলের সাজা নিজেকে দেওয়া।”

রাধা আবার জিজ্ঞাসা করলেন-“প্রেম এবং বন্ধুত্বের মধ্যে পার্থক্য কি?”

শ্রীকৃষ্ণ এবারও চমৎকার উত্তর দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন-“প্রেম হল সোনা আর বন্ধু হল হীরে, সোনা ভেঙ্গে তাকে জোড়া যায়, কিন্তু হীরে ভেঙ্গে আর জোড়া যায় না।”

রাধা এবার শ্রীকৃষ্ণ কে বললেন-“আমি কোথায় কোথায় আছি?”

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন-“তুমি আমার হৃদয়ে, হৃদ স্পন্দনে, আমার শরীরে, আমার মনে, সব জায়গায় আছো!!”

রাধা জিজ্ঞাসা করলেন-“তাহলে এবার বল, আমি কোথায় নেই?”

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন-“আমার ভাগ্যে!!”

এবার রাধা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন-“প্রেমের আসল কারণই বা কি আর মানেই বা কি?”

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন-“যেখানে কারণ থাকে, মানে থাকে, সেখানে আসল প্রেমই বা কোথায় থাকে?”

সবশেষে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন-“তুমি প্রেম করলে আমার সাথে আর বিবাহ করলে রুক্মিণী কে! এরকম কেন?”

শ্রীকৃষ্ণ আবারও উত্তর দিলেন, বললেন-“প্রিয়ে!! বিবাহ দুটি মানুষের মধ্যে হয়, কিন্তু তুমি আমি তো দুটি শরীর, একটি প্রাণ, আমরা যে একাত্মা।”

তাই পরমাপ্রকৃতি রাধারাণীর কাছে আমাদের একান্ত প্রার্থনা:

“নিকুঞ্জমে বিরাজে ঘনশ্যাম রাধে রাধে,
ঘনশ্যাম রাধে রাধে তু শ্যাম সে মিলাদে,
রাধিকাজীবন শ্যাম যদুপতি রাধিকাজীবন শ্যাম,
জয় পরমেশ্বর রাধা প্রাণেশ্বর জয় রাধাপ্রাণপ্রীতম।
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ জপো অবিরাম
রাধেকৃষ্ণ রাধেশ্যাম রাধা প্রীতম শ্যাম।”

BANGL

চিত্র সৌজন্যে : গুগল
তথ্যসূত্র : শ্রীমদ্ভগবতম, নারদপঞ্চরাত্র

JAI SHRI KRISHNA

॥সমাপ্ত॥